সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

পথে ও পথের প্রান্তে। রানী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত
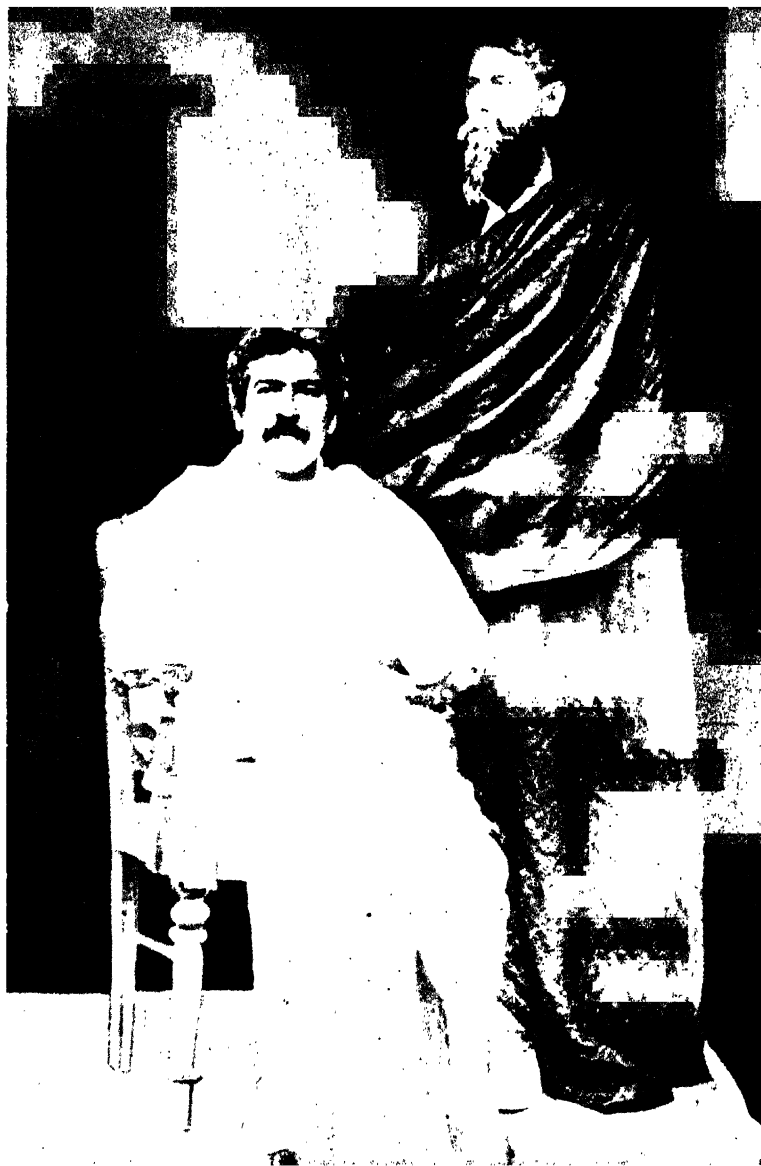
ষষ্ঠ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ ষষ্ঠ খণ্ড

জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ বৈশাখ ১৮৭৯ : মে ১৯৫৭

সংস্করণ মাঘ ১৩৯৯ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

পুলিনবিহারী সেন - কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক ম্যাসকট প্রেস

২৪৬এ/বি মানিকতলা মেন রোড। কলিকাতা ৫৪

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪
[19 July 1897]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১
২৬ মে ১৮৯৯

ওঁ

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে— প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে— ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জ্জিলিঙেও যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে— সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি— এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে— জোর করিয়া মনটাকে

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়— কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে— যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে— তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত— পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে— কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়— উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে— এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেষু

দার্জ্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জ্জিলিং ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেরূপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে এখন বোধ করি নদীনির্ঝর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে— আপনারা কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অনুসরণ করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে, এবং পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু জানালা আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিক্‌ল্ চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম— সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধশ্রুত

গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না— যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারোজন লোক অহর্নিশি

তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লরেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম— তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৭ সেপ্টেম্বর [১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করচি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্‌। কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না— যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন— আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্‌মাস্‌ করতে পার্‌বেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব— আপনি কি কর্‌লেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ কর্‌তে হবে না, কেবল টাইম্‌স্‌ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোন্‌বামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন

আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বল্‌বে, আমরা বড় কম লোক নই ; অন্য কাগজে বল্‌বে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার কর্‌চি ;— এদিকে আপনার জন্যে কায়ো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আন্‌বেন তখন আপনি আমাদের ;— চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই ; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি— আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোছুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী কর্‌চিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ কর্‌বার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে

হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে— অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকৃতে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টান্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌চে— কিন্তু আমি নড়্‌চিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা কর্‌তে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল— কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা কর্‌চি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক্, উড়িষ্যায় হোক্, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত কর্‌বেন না— সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌চি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ কর্‌চেন— বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা কর্‌বেন— আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল

মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি। আমি ছবি আঁকৃচি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখ্‌তে ব'সে গেছে শুনে বোধহয় কম আশ্চর্য্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ কর্‌চে। দুই-একটা নমুনা দেখ্‌লে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন :—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্‌ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্‌ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে!

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্‌ জারি করেচে— সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়— আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিন্‌তে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়্‌তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ কর্‌চেন— পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত

ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পার্‌তেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী কর্‌তে পার্‌ত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্চে— মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলাদরজাগুলো দুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্চে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীর ভাব এনেছে— সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে— তার পরে আবার যেদিন একটু বাদ্‌লা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটী নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আছি— ঝর্‌ঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়্‌চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন— তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাক্‌বে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুক্‌রো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখ্‌বেন। কে কি বল্‌চে, কি লিখ্‌চে, কি হচ্ছে সমস্ত আদ্যোপান্ত জান্‌বার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন [১৩০৭]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০]

বন্ধু

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই— শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তি-নিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে:— পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি

পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি— আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
২০ নভেম্বর ১৯০০

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বদ্ধ থাকতে হয়েচে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্ব্বে এখানে যখন আস্‌তুম তোমাদের ওখানেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল— তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আস্‌তুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করচি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি— সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে

তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব— তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্যে ধরেছি— কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারি নে। সে এখন আমার কাব্যনির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি— তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্ব্বাসিত করে বইটাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে— এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কণ্টক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল— তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে

যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপ্‌তে দেব— বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জ্জন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজ্‌বে কি না জানি নে— এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম— তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম— তিনি ভারি খুসি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি— সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি— শিলাইদহের নীড়টির জন্যে প্রাণ কাঁদচে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [১৯০০]

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে— তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর— কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন— এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—

ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ— জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গবর্ম্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে— অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ডিসেম্বর ১৯০০]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮

[ডিসেম্বরের শেষ ১৯০০

বা জানুয়ারির প্রথম ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন— সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না।

কিছু দিন রোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা লিখিতে হইল— তাহার পরে ভারতীর জন্য "চিরকুমার সভা" লিখিতে হইল— তাহার পরে সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়া গেল— আমাকে রঘুপতি সাজিতে হইয়াছিল —এই সমস্ত ঝঞ্ঝাটে বিব্রত ছিলাম।

বিসর্জ্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে— আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করিয়া লইতে চান— নিরুৎসাহজনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে— ফস্ করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ— বড়দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

৯
জানুয়ারি ১৯০১ ?

ওঁ

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ— সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না— আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০
মে ১৯০১

ওঁ

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে— আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি— কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই— কিন্তু কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ— কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্‌-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার ? নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি ; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে— মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন— তাঁহার মাছের ঝোল এখনও ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ— মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন— তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন— তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।

১১
২১ মে ১৯০১

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও— ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিমটি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২১শে মে
১৯৩৩

প্রিয়

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখনো তাগিদ করিনে।

পৃথিবীতে সর্বত্র শিল্পকলার যে উৎসাহ তুমি বের করেছ সেইটে শুনে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। একদিন এরা পাশ্চাত্য আমাদের বিজিতজাতি বলে অবজ্ঞা করেছিলেন এবারে তোমার প্রসাদে তাদের উপর প্রতিশোধই নিতে পারবে। তাদের দেবার শিল্পকলা আর কিছু আরও আরও — ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা।

এমন থেকে আদালতে যদি অপরাধী
ওড় অপরাধের বিচার হয় তাহলে
বিচারক তাদের যেমনটি দণ্ড বিধান করে
পারবে।

যদি পাঁচ ছ বছর তোমাকে বিলাতে
থাকতে হয় তুমি অবশ্য কাজে প্রস্তুত হোয়,
অর্থাৎ ভারতবর্ষের মনুষ্যত্বের মধ্যে এসে
ওটা নষ্ট কোরোনা। তুমি আমাকে একটু
বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বছর
সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ
সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার
কাছে লেশমাত্র সংকোচ কোরো না।
বছরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে
তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার
আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে
ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার
কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার
ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে
খোলসা করে লিখো।

লোকেরা যাত্রা করে বেরিয়ে যাচ্ছে,
একদিকে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই
দেখা করেছে। তার প্রতি আমার
ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভারি ইচ্ছে করত
তোমরা সব দুইজনে মিলে তোমার
ওখানে মাঝের বেলা গেলে আমিও
কাছে থেকে কোনো একটা দুইজনের
মধ্যে বসিয়ে দিই। আর একবার
আমি লোকেদের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে
ছিলুম — তখন তোমরা কেউ সেখানে
ছিলে না — আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত
বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে
ছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে
পাঁচ ছয় বছর থাকা হয় তাহলে কি
একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা
হবে না? আশা করচি দেখা হবে।
হয়ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠকঠক

সঙ্গে যা পড়বে।

চতুরঙ্গের প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামায় আমি মন দিতে পারিনি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

[illegible]

কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে। আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম— তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা— আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয় ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারি নি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

১২
৪ জুন [১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে— বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম —আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—
২১শে জ্যৈষ্ঠ। [১৩০৮]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৩
৩ জুলাই ১৯০১

ওঁ

৩রা জুলাই
১৯০১

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষর-সহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হই-য়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্‌ট্রিশ্যান্‌ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে

দিয়াছিলাম— পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে— দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই— তখন ইলেক্‌ট্রিশ্যান্‌ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্ম্মানি ও অ্যামেরিকায় যাইবার কোনপ্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘ-কাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হৌক্‌ একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪
২৫ জুলাই [১৯০১]

ওঁ ২৫শে জুলাই [১৯০১]

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থসঙ্কট, সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না— কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ... ... তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিয়ো। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব— না

যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না— তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে— সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

[অগস্ট ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো— তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কার-রূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাই-বার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

তোমার রবি

উপবিষ্ট : জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
দণ্ডায়মান : রথীন্দ্রনাথ, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'শিলাইদহের গ্রুপ'

বিলাতে জগদীশচন্দ্র। ১৯০১

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত

১৬

[অগস্ট ১৯০১]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে— এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না— কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম্ম, না, কর্ম্ম; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিদ্যা, না, উদ্যম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত

হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জ্পে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম,

আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল— রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে! একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব— আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই— তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

১৭
[সেপ্টেম্বর ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু

আজ মিস্ নোব্‌লের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে নির্জ্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্ম্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা

করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্ক্যুলর রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।

তোমার রবি

১৮
[অক্টোবর বা নভেম্বর] ১৯০১

ওঁ আগরতলা

কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই— সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন— স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্য-

সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি— আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন!

তোমার

রবি

১৯
[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না— তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল— নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে— তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো— তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে

দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে— তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না— তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে— বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না— মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে

যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে— তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত— তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না— ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না— তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না— তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০
[মে ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন— তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে— যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না— তাহা ভারতবর্ষের

হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে ; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১
২০ জুন ১৯০২

ওঁ

৬ই আষাঢ় ১৩০৯
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে— কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেইজন্য হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারিদিকে অবারিত প্রান্তর— কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্থল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষারাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় ক্রোশ —চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় একবার তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি— বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি— এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—

তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? একএকবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি— সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি— হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না— আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক— কেবলি ঘুরিতেছে— ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম— মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়? এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোনমতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষঘূর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে— কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র— নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র— এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেই-খানকার জন্য দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার

আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্য যেন শোনা যায় না— তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান-দিগ্বিজয়যাত্রার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাদ্যই বাদ্য, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক্।

তুমি জর্ম্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব — তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস— তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করিয়ো।

তোমার রবি

২২
৩০ জুন ১৯০৩

ওঁ Thomson House
১৫ই আষাঢ়
১৩১০

বন্ধু

রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহারা রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে— কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম— বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে— বুকের ব্যথা নাই— বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে— আশা করিতেছি এই ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সৎকার সদ্গতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই— সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে— কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর

বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও— ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিঘ্ন হইতেছে — তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও— ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও— অধ্যয়ন অধ্যাপনের নিয়ম বাঁধিয়া দাও— নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলাস্থাপনা কঠিন হইবে— বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এবং বর্ত্তমান অরাজকতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন দিনরাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে— অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না— তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিয়ো না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে সত্বর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। রেণুকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইতেছে—

চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প— এইজন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না— তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরো অনেক খাটাইব। এ বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যত-ক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব ?

তোমার রবি

২৩
[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫ ?]

ওঁ

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়— আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মুলতবি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্ব্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি— পূরা বেতন পাইলাম কি না সে-হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই— এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অন্যায় নয়— এবং সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাই— সম্মান-সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কৃপণতা নাই— ছেলে-বেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভাল-বাসিয়াছি— আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না

পাই ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি— ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠা'নকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

২৪
৮ জানুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে

—এখন আর সিডিশনের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দেমাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে— চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান— চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়— আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে।

সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে— নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়ো— সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১২
বা জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

ওঁ

বন্ধু

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন্ সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব একথা মনে করিয়া আসি নাই— যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে— বিশেষত ইংরেজি

ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে— তাহাতে আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে— অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা শুভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাক্‌মিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জ্জমা করিয়াছি— সেগুলি এখানকার রসজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাল লাগিয়াছে— এবং সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে— যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন— মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি— দেশে ফিরিয়া গিয়া

সেখানকার অবারিত আকাশ অপর্য্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে— সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অন্যায় হইবে তাই এই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

২৬
১৫ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
15 May, 1913.

বন্ধু

তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত সুখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে—আর অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্রা"র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন

টিঁকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হাতের কাজগুলা কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক হইতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

১৯ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন
জয়মাল্যে ভূষিত না দেখিয়া বেদনা
অনুভব করিয়াছি। আজ তাহা
দূর হইল। ভগবান এই
কল্যাণ আরও কি করিয়া তোমার
উত্তরোত্তর বাড়াইবে? চিরকাল
শক্তিশালী হও, চিরকাল
জয়যুক্ত হও। ঈশ্বর তোমার
চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি-উপলক্ষে

২৭
[১৪ এপ্রিল ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
[১ বৈশাখ ১৩২১]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই করচি—এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

[সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬]

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাব্‌বার অবকাশ নেই— কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই— বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েচে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় কর্‌ব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাক্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!"

এস ব্রহ্ম মহাসবে, মাতৃ আশীর্বাদবলে,
সকল সাধক এসহে, ধন্য কর এ দেশেহে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জ্জয়শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজেহে!
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী,
নাশ ভারতলাজেহে!
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল
কীর্ত্তি অম্বর মাঝেহে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজহে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজহে!
জয়হে, জয়হে, জয়হে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ অগ্রহায়ণ
১৩২৪

বসু-বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে আবাহনসঙ্গীত

এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়— তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে— তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি— তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত' কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন কর্‌তে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা— এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ— তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতি-ষ্ঠিতা কর্‌চ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে— দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান কর্‌তে থাক্‌বেন।

দেশে ফের্‌বার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম ঊর্দ্ধশ্বাসে লাটিমের মত ঘুরে' বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২৯

[অক্টোবর ?, ১৯১৭]

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল— এখন ভাঙন ধরা সুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দ্দা প'ড়ে গেছে— ভাল ক'রে শুন্‌তে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি কর্‌তে হয়। ডাক্তার বল্‌চে, একেবারে চুপচাপ ক'রে থাক্‌তে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্যে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে— সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বল্‌বার জন্যে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা কর্‌ব— এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুব মার্‌ব। কোনো নূতন যায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক কর্‌চি— সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি— কেউ লোক-জন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চল্‌বে না। কান্‌টা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে— না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পার্‌লেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেক্‌চারের জন্যে কবে তৈরী হ'ব তা বল্‌তে পারিনে— বোধহয় এখন থেকে কর্ত্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে— এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করব— যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন— কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আস্‌চি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে— কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে— এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল— সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ত।

ঠিক বর্ত্তমানে সে-রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি— কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে— সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দর্‌বার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অন্যদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেচে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্যে কথা ক'বে এইটেই হচ্চে আবশ্যক— নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫

তোমার রবি

৩১
২৪ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

বন্ধু

তোমার "অব্যক্ত"র অনেক লেখাই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত— এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত— কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

তোমার রবি

৩২
[১২ মে ১৯২২?]

ওঁ শান্তিনিকেতন

বন্ধু

"বিশ্বভারতী"কে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্চি। তোমাকে এর ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশি কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার সঙ্গে নামের যোগ না থাক্‌লে চল্‌বে না— সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘট্‌বে।

এখানে কিছুদিন বিপরীত গরম গিয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে একএকদিন আকাশে বাতাসে অগ্নিবাণ ছুট্‌তে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আমার মন বিচলিত হয়েছিল; ভেবে-ছিলুম দার্জ্জিলিঙে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আস্‌ব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর Constitution দেখিয়ে সভ্য করে আসব। কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই আমার সমস্ত সময় এবং সম্বল খরচ করতে হচ্চে— আমার না আছে অবসর না আছে পাথেয়। সমুদ্র পার থেকে দুইএকজন আমার কাজে যোগ দিতে এসেচেন, তাঁদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারচিনে।

Constitutionখানা ছাপা হয়েচে, রেজেস্ট্রি হয়ে গেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ [১৩২৯? 12 May 1922?]

তোমার রবি

৩৩
২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর একটার ভিতরে এসে নিজে সুদ্ধ যেন খাটো হয়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো, এই প্রাণ— এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল— মনে যে অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মায়ার কুয়াশা দূর হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে— কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে— সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌঁচেছিলুম। কলকাতায় যে কয়ঘণ্টা ছিলুম অবকাশমাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে

আসতে হোল— তাই তোমার সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহরে ফিরব নিশ্চয় জানিনে— কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি— সে কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কার।

৩৪
৮ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ　　　　শান্তিনিকেতন

বন্ধু

এখানে এসে কিছু ভালো আছি। কিন্তু চলতে ফিরতে কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়। ডাক্তাররা অন্তরে বাইরে উল্টে পাল্টে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেচে। বলচে কোনও কল একটুও বিগড়োয় নি— নাড়ীতে রক্তস্রোতের ব্যবহার খুবই ভালো। নানা দুশ্চিন্তা ও কাজের তাড়ায় আমাকে জখম করেচে। এখানে সকালে বিকালে খুব অল্প অল্প করে একটু বেড়ানো অভ্যেস করচি— বেশি পারিনে। লিখ্‌তে পড়তে একটুও শ্রান্তি বোধ করিনে। নানা লোক এসে নানা বাজে কাজে আমার উপর উৎপাত করে সেইটেতে বড় পীড়ন করে।

রথীদের কাছে তোমার ভিয়েনার সমস্ত খবর শুনে খুব আনন্দ বোধ করেচি। যখন দেখা হবে সব কথা শুনব। আজ আমার একজন চীনদেশী বন্ধু আসচেন তাঁর জন্যে ব্যস্ত আছি। যখন তাঁদের দেশে গিয়েছিলুম ইনি আমাদের অজস্র আতিথ্য করেচেন। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯২৮

তোমার রবি

বৌঠাকরুণকে সাদর অভিবাদন।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে

স্পন্দবেগে নিঃশব্দ সঙ্গীতগীতি; নীরব সুরের
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিদিকে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি'; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানবমর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়,—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,

জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্ম মাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে

চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫
[30 Nov. 1928]

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে

৩৫
২৪ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

বন্ধু

তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে কিছুই করবার উপায় নেই এই আমার দুঃখ। চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েচে —চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়। যতটুকু আমার নিজের যথার্থ কাজ তার বেশি কোনো ভার নেওয়া আমার উচিত নয়— কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা এসে পড়ে তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। শীতকালে আগন্তুক অতিথির সমাগম বাড়তে থাকবে সেইটেতে আমাকে বড় ক্লান্ত করে।

রথীর চিঠিতে শুনেছিলুম সুইজারল্যাণ্ডে তোমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আশা করি সেটা এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

আগামী গ্রীষ্মে য়ুরোপে গিয়ে আর কিছু না করে একবার শরীরটাকে সারিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব।

তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

বর্ত্তমান দুর্য্যোগ উত্তীর্ণ হয়ে তোমার শরীর মন সুস্থ সবল থাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৩৫ [৭ কার্ত্তিক]

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু

তোমার ছুটি যদি এখানে কাটিয়ে যাও তা হলে বোধ হয় তোমার উপকার হয়। আমি ত জ্বর প্রভৃতি নিয়ে এসে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি— ওজনে প্রায় ৩ সের বেড়েছি। তুমি বৌঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে এস— তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জিনিষপত্র কিছু আনবার চেষ্টা কোরো না। বিছানা যথেষ্ট আছে— কেবল গায়ে দেবার কম্বল এনো। তোমার জন্যে চা চুরুট তামাক প্রভৃতি সমস্ত নেশার জোগাড় করে রেখেছি। পড়বার বই এবং লেখবার অবকাশ এখানে যথেষ্ট পাবে— বেড়াবার মাঠ এবং সঙ্গীরও অভাব হবে না। আমি আজকাল সকালে তিন ঘণ্টা বেড়াই, এ-কথা চিঠি পড়ে তোমার বিশ্বাস হবে না— এখানে এলেই প্রমাণ হবে।

তুমি যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তা হলে সন্ধ্যেবেলায় ঠাণ্ডা লাগ্‌বার আশঙ্কাটা থাকে না। সে গাড়িটা সাতটার সময় ষ্টেশন ছাড়ে। এখানে এসে প্রায় বারোটার সময় পৌঁছয়— বর্দ্ধমানে দশ মিনিট থামে— আগে থাকৃতে ব্রেকফাষ্ট টেলিগ্রাফ করে দিয়ে ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে তুলে নিতে পার।

কবে ও কখন ছাড়বে সে-খবরটা আমার চিঠি পেয়েই আমাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ো— তা হলে তোমাদের যান বাহন ঘর প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখে দেব। ইতি বুধবার।

তোমার রবি

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত

১
৪ জুন ১৯০১

ওঁ

কলিকাতা
৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু

আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।

বন্ধুকে তাঁহার কর্ম্মসমাধার পূর্ব্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাঁহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব— তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন।

আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন— সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়-মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক্!

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
১৬ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মাননীয়াসু

ঠিক নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে আপনার চিঠি আনন্দসংবাদ বহন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই প্রান্তরের মধ্যে আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিতবাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আমরা আমাদের বিদ্যালয়গৃহে বসিয়া ছিলাম এমন সময় আপনার পত্রখানি আসিয়া আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিল। আমাদের এই বাংলা দেশের নববর্ষের আনন্দ অভিবাদন আপনারা গ্রহণ করুন। অধ্যাপকমহাশয় জয়যুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না— নিঃশব্দ ভারতবর্ষ তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিবে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কেবলি ইচ্ছা হয় আপনাদের দেখিয়া আসি। নানা কারণে আমি তাহাতে অক্ষম। যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—

অধ্যাপকমহাশয়কে তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।

আমার এখানকার খবর আপনি নিশ্চয় জানেন। আমি এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভৃতে পড়াইতেছি। আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান্ হইয়া উঠিবে। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
[অক্টোবর ?, ১৯০৩]

ওঁ সোমবার

মাননীয়াসু

বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল— তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম— আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম— এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে? আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভস্ম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে— সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না— আমি রণে ভঙ্গ দিব না।

ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেড্‌মাষ্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে

ফিরাইয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এখন হইতে আপনি আর কিছুই ভাবিবেন না।

আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জ্জিলিঙে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহিতাম না। কিন্তু বালককালে ইস্কুল পালাইয়াছি এ বয়সে আর চলে না। আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ মুলতবি আছে— আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম— ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম— কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি— আর কই মাছ নয়— দ্বিপদ চতুষ্পদের ত কথাই নাই। কলিকাতার চেয়ে শরীরটা অল্প একটু সারিয়াছে। যদি ছুটি লওয়া সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ করি তবে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে নড়িব না। আমার বোটে কি আপনাদের টানিতে পারিব না? আমাকে নিঃসহায় পদ্মায় বিসর্জ্জন দিবেন? আমাকে যদি এমন করিয়া অবহেলা করেন তবে একলা এই শরীরটাকে লইয়া কত করিব?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
১৯ জুলাই ১৯০৬

ওঁ বোলপুর

মাননীয়াসু

অরবিন্দের জন্য কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিম্মা করে দেব— তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজ্‌নের ডাঁটা, কুম্‌ড়োর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।

আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে— আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন। তার প্রধান কারণটা আপনাকে বলি। সম্প্রতি আমার বয়স যে যথেষ্ট হয়েছে সে ঢাকবার কোনো উপায় নেই— আমার দেহযন্ত্র এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মশায়ের চেয়ে ঢের বেশি সরল। আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি— তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম— তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি। আপনার বয়স আমার চেয়ে কম

কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের স্নেহ করবার স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন —সেজন্যে আপনাদের বয়সের অপেক্ষা করতে হয় না— সকলের দাবী মিটিয়ে সকলের ভাগ চুকিয়ে আমার মত জরাজীর্ণের জন্যও কিঞ্চিৎ বরাদ্দ করে দিলে স্নেহের নিতান্ত অপব্যয় হবে না। আমাকে যদি "আপনি" বলা ছেড়ে দিয়ে "তুমি" বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারেন ত উত্তম— যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি "কবিবরেষু" বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে— সেটাকে যদি দুর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।

দ্বিতীয় নিবেদন, বোলপুরে আসবার জন্যে প্রস্তুত হোন। বিলম্ব করবেন না। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৩।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর ১৯০৫ বা ১৯০৬]

ওঁ

বোলপুর

বৌঠাকুরাণী

আজ আপনার সস্নেহ পত্র পাইলাম। ইচ্ছা ছিল লিখি যে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ— কিন্তু দুই কারণে লিখিলাম না— এক, লিখিলেও আপনার দয়া উদ্রেক করিত না, দুই, সম্প্রতি আমার শরীর খারাপ নয়। শেষ কারণটা তেমন গুরুতর বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু প্রথমটা মারাত্মক— অতএব খুব উচ্চ কণ্ঠে সতেজে বলিতেছি বেশ আছি, ভাল আছি, রোগের কোনো চিহ্নও নাই।

নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না— আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।

আমি বোলপুর বিদ্যালয় খোলার অন্তত দুই সপ্তাহ পরে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হইব অতএব আপনাদের সঙ্গে তৎপূর্ব্বে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যদি বোলপুরে পদার্পণ করেন তবে আরো সত্বর দেখা হইতে পারে বিশেষ আপনি

যখন অনেকবার— , থাক্, এ নিষ্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে— মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফরপুর গেছে— তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে।

অরবিন্দর সহপাঠীরা সকলেই কার্ত্তিক মাসের জন্য বাড়ি গেছে— কেবল যোগেন আছে। সেও দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কেবল ছুটির জন ছয় সাতেক ছাত্র থাকিবে। অজিতও আজ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লি অভিমুখে রওনা হইল। অরবিন্দ ফিরিয়া আসিলে, যদি ইচ্ছা করেন, ত এখানে পাঠাইতে পারেন। তাহার অঙ্ক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এখানে আছেন। ইতি। ৩১শে আশ্বিন ১৩ [১২ বা ১৩]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
[এপ্রিল ১৯০৮]

ওঁ　　　　　　　　　　　　কলিকাতা

মাননীয়াসু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্যে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌ছে ;— হয়ত একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে— কিন্তু সে পরিবর্ত্তন উপর থেকে দেখা যায় না— সে পরিবর্ত্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।

ভেবেছিলুম ছুটি নেব কিন্তু আমার কাজের ভার আরো বেড়ে গেছে। আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা

পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়— ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুরা পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন— তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন— পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাবচেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি। অথচ এঁরাই মডারেট দলকে কর্ম্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করচেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভা-স্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্চি নে— কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা

যখন ফিরে আস্‌বেন— আশা করচি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

আপনি লণ্ডনে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চান সেইটেই আপাতত অবলম্বনীয়। এমনি করে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের বাড়িতে উপাসনাকার্য্য হতে হতে এর পরে স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হবে। ওখানে যে উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেচেন তার মধ্যে অন্তত গুটি দুই তিন উপনিষদের মন্ত্র রাখবেন— ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধটা সে দেশে এই রকম করে বিশেষ ভাবেই স্বীকার করা চাই। এতে ভারতবাসী প্রবাসীরও উপকার হবে, আর সে দেশের লোকের কাছেও ব্যাপারটা শ্রদ্ধেয় ও মনোহর হবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছি। এদিকে নিদারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ও বন্ধ করতে হ'ল— আবার কোথায় পালাব তাই ভাবছি— কলকাতায় বাস করা অসম্ভব।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৭
২৪ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরাসু

মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি— তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, মনে কোনো আশঙ্কা নেই। শেষযাত্রারও দেরি নেই তা জানি। দুঃখ তাদেরই যারা পিছনে পড়ে থাকে। বাইরের কোনো সান্ত্বনাবাক্যেই তাদের বিচ্ছেদের অভাব লেশমাত্র পূরণ করতে পারে না। যে অসামান্য নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে আপনি তাঁর সেবা করেছেন তারই মহত্ত্ব আপনার অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান করবে, আপনার জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা আপনার শোককে মহোচ্চতা দেবে এ ছাড়া আজ আর কিছু বলবার নেই। ইতি ২৪।১১। [১৯]৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

১ ওঁ "UTTARAYAN"

SANTINIKETAN

BENGAL

বন্ধু

তোমার সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকতে পারব আশা করেছিলুম কিন্তু এখনো চলতে ফিরতে কষ্ট হয়— প্রায় সমস্ত দিন কেদারা অবলম্বন করে থাকি। সকালে খুব অল্প একটুখানি হাঁটি, তাতেই হাঁপিয়ে পড়ি। রেলে যাতায়াত করতে ভয় পাই।

আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েচি, আশা করি তোমার হাতে পৌঁচেছে— তোমার সেদিনকার অভিনন্দন সভায় এই আমার অর্ঘ্য। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো— কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি— ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ। তোমার কর্ম্মে তোমার সহযোগিতা করি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু বন্ধুর প্রীতি সংসারপথের পাথেয়, অন্তর থেকে তাই তোমাকে নিবেদন করতে পেরেছি এই কথা মনে রেখো। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

তোমার রবি

২

ওঁ

সুহৃৎ,

আসিয়াছিলাম— চলিলাম।

সোমবারে শিলাইদহ যাইব। ইহার মধ্যে সে অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে কি, সার্কুলার রোডের বাড়িতেও গিয়াছিলাম, সেখানে দ্বার জানালা রুদ্ধ— এখানে দ্বার জানালা উন্মুক্ত, কিন্তু ফলে তফাৎ হইল না। কিন্তু চলুন পদ্মাতীরে— সেখানে চমৎকার ঝড়বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ চলিতেছে— এইরূপ দুর্য্যোগে ম্যাকবেথের তিন উইচ্ মাঠের মাঝখানে সম্মিলিত হইয়াছিল— অধিক আর কি বলিব। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩০৭

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবলা বসুকে লিখিত

আজ আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম।

অরবিন্দ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বল্‌বেন একথা আমি অনেকদিন থেকে প্রত্যাশা করে আছি। কারণ অরবিন্দকে যখন আমার হাতে মানুষ হবার জন্যে আপনি দিয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে আমার চিরন্তন মঙ্গলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এখন থেকে অরবিন্দকে নিয়ে যখন যাই করুন না কেন আমাদের এই সম্বন্ধটিকে হিসাবের মধ্যে আন্‌তেই হবে।

অনেক জিনিষ আছে যা ভাড়াটে গাড়ির মত— যতক্ষণ তার প্রয়োজন, ততক্ষণই তার ব্যবহার, ততক্ষণই তার সঙ্গে সম্বন্ধ। কিন্তু যেখান থেকে আমরা এমন কিছু পাই যা আমাদের মনুষ্যত্বের সম্বল, তার সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের চিরকালের গভীর যোগ জন্মে যায়। পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সেইরকম বড়, গভীর এবং নিত্য সম্বন্ধ জন্মে যায় তারা লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে রক্ষা করে এবং সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প মানুষেরই এমন সুযোগ ঘটে। পৃথিবীতে চিত্তকে সুদূর গভীরতার মধ্যে প্রেরণ করে' চিরদিন প্রাণরস মঙ্গলরস সঞ্চয় করবার মত জায়গা আমরা বেশি পাইনে— এবং আমাদের অনেকেরই এমন শক্তি নেই যে আমরা কোথাও চিরন্তন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি। যদি এ কথা সত্য হয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে অরবিন্দের একটি সত্যকার যোগ স্থাপনা হয়েছে তবে সে জন্যে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবেন না, বরঞ্চ অরবিন্দের জন্যে আনন্দিত হবেন। আমি যে এ কথা বলচি তার কারণ এ নয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ একটা শক্তি আছে— এ বিদ্যালয় কাউকে বিশেষ কিছু দিতে পারে না— কিন্তু যে ব্যক্তি তপস্যা করে নিতে পারে সে আপনার শক্তিতেই সমস্ত উপলক্ষ্য হতেই সার সংগ্রহ করতে পারে। সেই তপস্যাকে জাগ্রত করাই হচ্চে কথা। বারো আনা লোক অত্যন্ত লঘুভাবে পৃথিবীর উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়, বিপদ সেইখানেই। জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর সম্বন্ধে সত্যতা যদি জন্মে যায় তাহলেই

মানুষ সার্থক হয়। বোলপুরের বিদ্যালয়ে অরবিন্দ আর কিছু পাক্ বা না পাক্, সে জীবনকে সত্য বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধিটি এমন একটি বড় জিনিষ যে, যেখান থেকে এটি আমরা পাই সেইখানেই আমাদের জীবনের গভীরতম শ্রদ্ধা জড়িত হয়ে পড়ে— না হয়ে উপায় নেই। যদি দেখ্তেন অরবিন্দের মনে সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়নি তাহলে নিশ্চয়ই জান্তেন তার চিত্তেও সে সেই পরিমাণ বড় জিনিষ পায় নি। এই জন্যে আমি আপনাকে বলচি অরবিন্দের জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

এ কথা নিশ্চয়, অনেক সময় নানা কারণে আমাদের মনে মোহ উৎপন্ন হয়— সেই মোহের বন্ধনও প্রচণ্ড প্রবল। আমাদের ছেলেরা অনেক সময় ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে আপনার মনপ্রাণ বিকিয়ে আসে সেটা তাদের পক্ষে কিছুতেই ভাল নয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এখানে মোহের কোনো উপকরণই নেই। যাতে মনকে বাইরের দিক থেকে ভোলাতে পারে এমন কিছুই এখানে দেখতে পাবেন না— বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অরবিন্দের মন এখানে বসে নি। ও যেন একেবারে উদাসীন ছিল। কোনো শিক্ষা বা কোনো কথায় ও মন প্রয়োগ করতেই পারত না। ওর সম্বন্ধে আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। পড়াশুনোর দিকেও ওকে আমি অগ্রসর করতে পারছিলুম না, ভিতরের দিক থেকেও মহত্ত্বের প্রতি ওর চিত্তকে জাগ্রত করতে পারছিলুম না, ক্রমে এই

বিদ্যালয় যখন ওর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করলে সে ত কোনো কৃত্রিম উপকরণ বা বাহ্য প্রলোভন দিয়ে নয়। সে নিঃসন্দেহ ক্রমশই আমাদের অগোচরে চিত্তের সামগ্রী কিছু পাচ্ছিল— যখন থেকে তাই পেতে আরম্ভ করলে তখন থেকে আপনিই আপনার মধ্যে ওর উদ্বোধন হতে লাগল। এই উদ্বোধনের মত এমন গভীর এবং বড় জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই— যে লোক তা উপলব্ধি করেছে সে তার আনন্দকে কোনোদিন ভুল্‌তে পারবেনা।

কিন্তু সত্য এমন একটি জিনিষ যাকে নিয়ে যেমন খুসি চলা যায় না। তাকে তার নিজের পথ খানিকটা ছেড়ে দিতেই হয়। যদি কোনো মানুষকে কোনো একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছার দ্বারা বেষ্টিত করে রাখতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে এই সত্য উপলব্ধির প্রবল বিকাশ থেকে দূরে রাখ্‌তেই হবে। শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণ যখন কর্ত্তৃত্ব করতে চেয়েছিল, যখন তাকে বিশেষ প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছিল তখন তাকে কেবল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি, তাকে সত্যলাভের সুযোগ থেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করেছিল।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এমন কথা বল্‌বেন না, যে মানুষের অন্তরাত্মার বিকাশ তার আর সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে বড় নয়। এই অন্তরাত্মার বিকাশ আপাতত সমাজে সংসারে যতই অসুবিধাকর হোক্‌ না, এর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ জিনিষ আর কিছুই নেই। অরবিন্দের অন্তরের মানুষের জাগরণ হয়েছে— তার ক্ষুধা, তার কান্না, তার চাঞ্চল্যকে আপনি যদি আপদ মনে করেন তাহলে ভুল

করবেন। উপবাসের দ্বারা, শাসনের দ্বারা, বাধার দ্বারা একে নিঃশব্দ ও নির্জ্জীব করতে হয় ত কিছুতেই পারবেন না— যদি তা পারেন তবে তার চেয়ে এমন পরম দুঃখের জিনিষ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু আমি হয় ত গোড়াতেই ভুল করছি। সম্ভবত অরবিন্দ জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে সেটাকে আপনারা ভাল বলেই মনে করেন না। ও যে রকম হলে আপনারা খুসি হতেন ও তেমনটি হয় নি— এবং সেই জন্যে নিশ্চয়ই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা, প্রভাব ও বিধিব্যবস্থাকে মনে মনে দায়ী করচেন— এবং ভাবচেন, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন থেকে নূতন পথে ওর জীবনকে প্রবাহিত করে দেবেন।

এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কথা কিছুই থাক্‌তে পারে না। যা ওর পক্ষে মঙ্গল বলে আপনারা বিবেচনা করবেন নিশ্চয়ই সেদিকে ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে বিরক্ত হয়ে যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হন তবে ওকে প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল পীড়িত করবেন, কোনো ফলই পাবেন না। মঙ্গলের পথ যন্ত্রের পথ নয়— সেখানে জোর খাটে না। ওকে আপনারা যদি না বোঝেন, তা হলে স্বভাবতই ও ক্রমেই আপনাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়বে. ক্রমেই আপনাদের বোঝার অতীত হয়ে উঠ্‌বে। ওর এখন এমন একটি বয়স এমন একটি অবস্থা যখন খুব বিবেচনার সহিত ওকে সকল দিক্‌ থেকে বুঝে ওর প্রতি একান্ত সহিষ্ণু হয়ে, ওর গভীরতম প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে' ওর বেদনায় বেদনা দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর

মত ওকে হাতে ধরে নিয়ে চল্‌তে হবে— রাগ করে ওকে আঘাত করলে সেই আঘাতের দ্বারা ওর ক্ষতি করবেন এবং ওকে হারাতে থাক্‌বেন।

আমার পক্ষ থেকে আমি একটি মাত্র কথা আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি। অরবিন্দকে যে আদর্শে তৈরি করলে আপনাদের মনের মত হত তা আমি হয় ত করি নি, কারণ করা হয় ত আমার পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু এ কথা মনে রাখ্‌বেন যে যদি বড়র দিকে সত্যের দিকে ওর জীবনের গতি অভিমুখ হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়। ও নিজের জীবনকে বড় রকম করে সার্থক করতে চায় এইটেই সকলের চেয়ে বড় কথা— কোন্‌ বিশেষ পথ দিয়ে করতে চায় তা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফল নেই। আমার হাতে যা ছিল, আমি যেটুকু পারি তা আমি ওর সম্বন্ধে করেছি— সে জন্যে যেটুকু অপরাধ সে সম্পূর্ণই আমার— ও বেচারার উপায় ছিল না— কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দণ্ড ওকেই ভোগ করতে হবে। অরবিন্দ যদি ইস্কুলে পড়া কলেজে পাস করা সাধারণ বালকের মত হত— অর্থাৎ চিত্ত বলে কোনো পদার্থ না থাকৃত, এবং যখন যে যা বলৃত তাই আবৃত্তি করত, চারদিকে যা শুনৃত তাই নির্ব্বিচারে শুনে যেত, তাহলে আপনারা কি খুসি হতেন? সত্যকে পাবার চেষ্টা ওর মনে যে প্রবল হয়ে উঠেছে সে যদি ভুল করেও হয় এবং ভুল পথেও যায় তাতে কি আপনাদের আনন্দের কথা কিছু নেই? পথের সংশোধন হওয়া শক্ত নয় কিন্তু এই চেষ্টাটাই জগতে দুর্লভ।

এবারে আপনাকে বোলপুরে আসবার কথা বলি নি— তার

কারণ, কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছিলুম এই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনার হৃদয় অনুকূল নেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি আমার জীবনের সাধনার ক্ষেত্র— আমার দেবতা এইখানে, আমার মুক্তি এইখানে— এ সামান্য ইস্কুলমাত্র নয়— এখানে আপনি মনে লেশমাত্র বিমুখতা নিয়ে আস্‌বেন, এখানে এসে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করে যাবেন এ আমার পক্ষে অসহ্য। অনেক লোক তেমনভাবে এখানে আসে যায়— আমি পৃথিবীর সকল লোকের কাছেই সহানুভূতির কাঙালবৃত্তি করতে ত চাইনে— কিন্তু আপনাদের তেমন উদাসীনভাবে দেখ্‌তে পারিনে। যে জায়গায় আমি সকলের চেয়ে সার্থকতা লাভ করেছি সে জায়গায় আপনাদের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে সেখানে খেলাচ্ছলেও আমাদের মিলন হতে পারে না— আর সব জায়গাই রইল— কলকাতা আছে, আমাদের পদ্মার চর আছে, আর যেখানেই বলেন সেখানেই কোনো বাধা নেই।

আজ বর্ষশেষের দিন! আমরা যিনি যে পথেই চলি না কেন, ক্ষমা রাখ্‌বেন— ফাঁকি দিতে চাচ্চিনে, প্রাণপণে চলচি এবং আরামের পথ বেছে নিই নি এইটুকু মাত্র দাবীর জোর রাখি, তার পরে সত্য মিথ্যা ভালমন্দর বিচারক যিনি, তিনিই যথাসময়ে বিচার করবেন। ইতি ৩০শে চৈত্র ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

১ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ

৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র

৪ রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর

৫ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্ব্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান

'কথা'র উৎসর্গ

সত্যরত্ন তুমি দিলে,— পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি— এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষি-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,— যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—

একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,— বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

[১৩০৮]

জয় হোক তব জয়
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমাল্য অক্ষয়।
বহুকাল হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরব অপমান মানি
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টিকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের
তোমারে না বাঁধি রয়।

সম্বর্ধনা-সঙ্গীত

ওঁ

জয় তব হোক জয়!
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়!
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।

মাঘ
১৩০৯]

অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ। পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য

বন্ধু,　　এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কি পেয়েছে আকাশ হতে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার　　লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,　　সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা!
আমার　　লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি,
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এযে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
১৮ আষাঢ় ১৩১৩

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদিবা আমাদের সূর্য্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধসত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই একথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট্, ব্যাবিলন্, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইহারাই জগতে সভ্যতার

শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্য্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড় বড় জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্দ্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজেদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্ব্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকার-মধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমত জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[১৩০৫]

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবং ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতিধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ

বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,— লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক্ হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ-প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of in-organic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদূষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব-পশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;— অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে

উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due tostimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্য-ভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,— পদার্থতত্ত্ব-সন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম ; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,— আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র ; —তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের

অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেণ্ট্ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিক্‌সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান-দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন,

বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা-বশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেণ্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,— চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান;— এই ত স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম

সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হৃতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি।

[১৩০৮]

জড় কি সজীব ?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈথর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফযন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে।

পুনর্ব্বার আচার্য্যবর য়ুরোপের পণ্ডিতসভায় নবতর তত্ত্ব উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়টার মোট কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতারা কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'গ্লোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। গ্লোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। এ জন্য তাঁহাকে ধন্য বলি। কিন্তু আগুন উস্কাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার লৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া যাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আদর

করিতে বসিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরূহ পরীক্ষায় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া সাড়া পাইয়াছেন। গ্লোবের উক্তিতে ইহা বুঝা যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম্ম আছে, অবৈজ্ঞানিক শ্রোতাদের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

জীবমাত্রই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। অন্তত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই। উদ্ভিদের চেতনা আছে কিনা, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে।

লৌহদণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেদনা বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না; কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না। অর্থাৎ সজীব পদার্থ আছাড় খাইলে তাহাতে আঘাতের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না। আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ শ্রোতার কথা উপরে লিখিলাম। এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞ কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে। তড়িৎ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পত্র ইলেক্‌ট্রিশ্যানে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্‌টি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ

যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) করাতের মত দন্তুর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্ন রূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আনে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা ও অন্য-মাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুন আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য, এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশান্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই

জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-সূচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দস্তুর— সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকাশ পায়;— ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্‌গণ উভয় চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাড়। আলোকজনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি

কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ-বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্ত্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্ত্তাবহন-প্রণালী উলট্পালট্ করিয়া দিবে।

[১৩০৮]

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।...

...এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া ;— অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা ; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো ; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা।

[১৩১১]

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না ?···

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন ?···

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞানপ্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

[১৩১২]

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্ম-প্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাক্‌ত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয়নি; সেইজন্তে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্ম যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে

ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চ্চনা সবই জুট্‌তে পারে; কিন্তু এখন পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জ্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকৃতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সাম্‌নে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ কর্‌বার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠ্‌চে। সেই তাঁর ধর্ম্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা

চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ত্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

২২ চৈত্র ১৩৩২

জগদীশচন্দ্র

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছি— তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ

দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল—কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে

এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পূরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী

করবেন আমার জানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হোতে লাগল, একথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি,

অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত। এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

[১৩৪৪]

Years ago, when Jagadis Chandra, in his militant exuberance of youthfulness, was contemptuously defying all obstacles to the progress of his endeavour, I came into intimate contact with him, and became infected with his vigorous hopefulness. There was every chance of his frightening me away into a respectful distance, making me aware of the airy nothingness of my own imaginings. But to my relief, I found in him a dreamer, and it seemed to me, what surely was a half-truth, that it was more his magical instinct than the probing of his reason which startled out secrets of nature before sudden flashes of his imagination. In this I felt our mutual affinity but at the same time our difference, for to my mind he appeared to be the poet of the world of facts that waited to be proved by the scientist for their final triumph, whereas my own world of visions had their value, not in their absolute proba bility, but in their significance of delightfulness. All the same, I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality. I remember often having been assured by my friend that I only lacked the opportunity of training to be a scientist but not the temperament Thus in the prime of my youth I was strangely attracted by the personality of this remarkable man and found his mind sensitively alert in the poetical atmosphere of enjoyment which belonged to me.

At this time he was busy detecting in the behaviour

of the non-living some hidden impulses of life. This aroused a keen enthusiasm in me who had ever been familiar with the utterance of the Upanishad which proclaims that whatever there is in this moving world vibrates with life. Afterwards he shifted his enquiries from the field of physics to the biological realm of plants. With the marvellously sensitive instruments which he invented he magnified the inaudible whisperings of vegetable life, which seemed to him somewhat similar in language to the message of our own nerves. My mind was overcome with joy at the idea of the unity of the heart-beats of the universe, and I felt sure that the pulsating light which palpitates in the stars has its electric kinship in the life that throbs in my own veins. I knew that this was not science, but my mind trembled with the hope that the opening message had already been declared and final evidences were in preparation.

At last when Jagadis Chandra sailed across the sea to place the results of his researches before the questioning scrutiny of the West, my heart expanded with an undoubting expectation of our country's claim to a world-recognition being accepted and at the prospect of a wide establishment of a wonderful truth which is native to our oriental attitude of mind. With what little lay in my power I helped him in his adventure but, fortunately, since then no more help was needed either in companionship or in other ways from a man like me who was too heavily burdened with his own responsibilities. His fame spread rapidly and material

contributions from all sides showered upon his schemes, which centralized at last in the Bose Institute. I fervently hope that the Spirit of Science will find its lasting shrine in this place and the aspiration of the great master will remain a living force in its heart, making it a perpetual memorial worthy of him.

This tribute of mine to the memory of Jagadis will appear inadequately feeble, especially in contrast to the repeated magnification of his name in my writings both in prose and verse at the time when his fame was not luminously apparent above the horizon and when, I am sure, my fellowship and unfaltering faith in his genius did hearten and help him. But my struggling health, which has lately been wrenched back from the grip of death, is incompetent for most of my important tasks and also the singing hope that began its first soaring in immensity has completed its journey in its terminus.

JAGADISH CHANDRA BOSE

Memorial Address

When by some fortunate chance I came into an intimate contact with Sir Jagadish, he was in the prime of his youth and I was very nearly of his age. At that moment his mind seemed entranced with a vision of the living creatures' fundamental kinship with the world of the unconscious. He was busy in employing his marvellous inventiveness in coaxing mute Nature to yield her hidden language. The response which he received through skilful questionings revealed to him glimpses of the mystery of an existence that concealed its meaning underneath a contradiction of its appearance. I had the rare privilege of sharing the daily delight of his constant surprises. I believe, poets inherit the primeval age in their temperament when things in their infant simplicity revealed a common feature. Somehow these lovers of *Maya* feel the joy of their being spread all over the creation, which makes them indulge in seeking the analogy of the living in things that appear lifeless. Such an attitude of mind may not in all cases be based upon any definite belief, animistic or pantheistic; it may be merely a make-believe, as we notice in children's play, which owes its origin to the lurking tendency in our sub-conscious mind to ascribe life-energy to all activities in the natural world. I was made familiar from my boyhood with the Upanishad which, in its primitive intuition, proclaims that whatever there is in this world vibrates with life, the life that is one in the infinite.

This might have been the reason of the eager enthusiasm with which I expected that the idea of the boundless community of life in the world was on the verge of a final sanction from the logic of scientific verification. Being allowed to follow the Master's footsteps in the privacy of his pursuit, even though as a mere picker of his casual hints, I had my daily feast of wonders. At this early stage of his adventure when obstacles were powerfully numerous and jealousy largely predominated over appreciation, friendly companionship and sympathy must have had some needful value for him even from one who to maintain intellectual communion with him lacked special competency. Yet I can proudly claim to have helped him in some of his immediate needs and occasional hours of despondency in those days of an inadequate recognition and feeble support that he received from the public.

In the background of that distant memory of mine, I find not the slightest gleam of a vision of the enormous success that could before long combine scientific renown with a vast material means adequate enough to build this Institute, one of the very few richly endowed mediums in India for bestowing the benediction of science upon his countrymen. In fact, it makes me laugh at myself to-day to read, in some of my old letters, my effort to encourage him with the likelihood of filling the gaps in his funds when my own resources were precariously limited to persuading friends who were foolish enough to have faith in me.

Still it is comically sweet to think of the proud magnificence in my assurance fitfully accompanied by contribution absurdly poor compared to the ceaseless flow of tribute that, later on, he could attract by his own magnetic personality and also by the general confidence he widely aroused in his genius. But I repeat again, it was sweet to have dreamed impracticable dreams and to have done however little it was possible, as it proves a courage of joy in the faith in greatness which itself is a bounteous gift to one's own mind.

However ill-equipped as I was by the deficiency in my training and by the poet's idiosyncrasy to be a fit companion to a man of science at a luminous period of his self-revelation, I was still accepted as his close friend and, possibly because of the contrariety in our natural vocations, I was able to offer some stimulation to his urge of fulfilment. Not having the necessary amount of vanity in my constitution, it had been the subject of constant wonder in my mind.

Since then time passed quickly, maturing the fruits of our expectation. During this period of his fast-growing triumph, I was modest enough to feel less and less the urgency of my comradeship in his journey towards the goal, which was no longer arduous or beset with uncertainty. And yet I can rightfully claim the credit for strengthening in some measure his trust in his own destiny, by adding to it my own unwavering faith, at that painfully hesitant moment of fortune during the dubious dawn of his career, when even

persons of meagre resources might have some important use.

Victory is the inalienable claim of all genuine power having the might of attraction that naturally exploits all kindred elements on its path and moulds them into an image of glory. And such an image is this Institute, which represents the Master's lifelong endeavour taking a permanent shape in the form of a centre for the inspiration of similar endeavours.

However, the early association of mine with the Master's first great challenge of genius to his fate, whose path at that time did not run smooth, belongs for me to a remote period of a history in which I feel myself hazily indistinct. And this made me seriously waver to accept the invitation for taking an honoured seat at a ceremonial meeting in this institution. The presumptuousness of youth made me absurdly proud to imagine that my companionship was growing into an organic part in the history that was being evolved before my eyes, and, in that belief I did try to hearten the hero, which was a part of my vanity. But foolish youth does not last for ever, and I have had time to come to realise my limitation. Anyhow it is quite obvious, that I am a mere poet carrying on my *sadhana* in the temple of language, the most capricious deity who is apt to ignore her responsibility to logic, often losing herself in the nebulous region of fantasy. Our oriental custom is to bring proper gifts to sacred shrines, but my gift of words for this occasion cannot but be out of place among the records of memorable

proceedings of a learned society.

Fortunately there are some few men among us who can claim fellowship with the aristocracy in the realm of science, and can be expected to make splendid this ceremony with the wealth of their thoughts. I can only bless this institution from that obscure distance where the multitude of the uncared-for generations of this country have helplessly drifted to the pitiless toil of primitive land-tilling. I offer my salutation to the illustrious founder of this Institute, humbly sitting by those who are deprived of a sufficiency of that knowledge which only can save them from the desolating menace of scientific devilry and from the continual drainage of the resources of life, and I appeal to this Institute to bring our call to science herself to rescue the world from the clutches of the marauders who betray her noble mission into an unmitigated savagery.

১ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

...জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দ-সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন— 'আপনার নূতন আবিষ্কার-গুলি পরমাশ্চর্যজনক।'... ২১ বৈশাখ ১৩০৭

২ ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

...আমি ভাবিলাম তোমরা রাজপারিষদ। লোকের সাধু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই— সকলকেই তোমরা সন্দেহচক্ষে দেখ— মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্য্যকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ। বস্তুতঃ মহারাজের মত লোকের সহিত সংশ্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে— আমি স্বার্থপর ভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। মহারাজ আমাকে মাঙ্গবন্ধু-ভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক কিন্তু শুনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে সুদূরে রাখিতে চেষ্টা

কর— সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয় সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছে। সেই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেবল জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব— ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র কিন্তু ধনী নহি— অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই— সুতরাং শুভকর্ম্মের অন্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাহার পরে যদি পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজেকে দূরে লইয়া গিয়া শান্তচিত্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব।··· [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

···আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়,

কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সে জন্যে প্রথমে, প্রোফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি যে, জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হোক্‌!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও, এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন:—

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও! আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল

করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ, নির্ম্মূল হইয়াছে— সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক্ আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ব বলে তাহাই মহত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার

বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা-দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশ-বাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।... আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস্‌ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গদ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।... ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৮

চিরানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?… মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে।… ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৯

অনুরক্ত ভক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ জোড়াসাঁকো

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মুলী বাঁশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলী বাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে।

পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সে জন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০।২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এগাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে— তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে। ··· ইতি ২রা আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…বিধাতা দেশ থেকে আমাদের তাড়া করেছিলেন এই জন্যে যে, মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব। এই জন্যে যে, আমরা আরামে থাকব না আমরা আলোকে বাস করব—আমাদের জন্যে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক্ আমি বেশ দেখতে পাচ্চি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে— কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোস্‌কে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়— তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েচেন এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসচে, পথে আর জায়গা হবে না। ইতিমধ্যে এক পয়সা দু পয়সার সাময়িক ও অসাময়িক পত্রগুলো কুণো-রাজ্যের দলাদলি নিয়ে কোঁদল করুক চীৎকার করুক, সে কারো কানে পৌঁছবে না— কেননা বাংলাদেশের অন্তরতম সাধন-লোকে সিদ্ধিদাতার আহ্বান এসে পৌঁচেছে।… ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬।।১২

৮ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত

…কোনো একটা জাতের সঙ্গে বৈষয়িক সম্বন্ধ থাকলেই তার বিকারে এইরকম অসত্য বুদ্ধি উগ্র হয়ে ওঠে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অবৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে মিলনের পথ উদ্‌ঘাটন করা। আমি য়ুরোপকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমি জানি ঐখানেই মানুষের মন সর্ব্বতোভাবে জেগেছে— এইজন্যে ঐখান থেকেই মানুষের সমস্ত কলুষ দূর হবে। যারা আধজাগা, আধমরা তারা নিজের অসাড়তার বোঝায় ধরণীকে ভারাক্রান্ত করে, এবং সজীব পদার্থকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অথচ আমাদের সুপ্তির তলায় একটা চিত্ত আছে, আমরা বর্ব্বর নই। জাগ্রত জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করব না, দান করব। জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্চেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডুক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চ্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্য-দর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণ-শক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েচে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে সজীবভাবে জানতে ও গ্রহণ করতে হলে য়ুরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে তার সহযোগিতা ঘটাতেই হবে।… ২৮ ভাদ্র ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ভাণ্ডার-সম্পাদক

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?

উত্তর : শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বন্ধে "ভাণ্ডারে" যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে এ দেশের য়ুনিভার্সিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই :— অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুসি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে ? ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলিবার

জন্য কি করা হইয়াছে? দেশের যথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা-পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্য দেশ জুড়িয়া সস্তায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরা জাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনের পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিদ্যা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথমপরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই;— যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াক্কড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী য়ুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যালজ্জার কোনো মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না— জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক্ না কেন, রাজবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে সেই আদর্শে লজ্জার বশে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না— আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে, গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিনসমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্ররা যাহাতে পুঁথিগতবিদ্যার শুষ্ককাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টিচালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

এরূপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ নহে।

[১৩১২]

54 Parliament Street
London, S. W.
16 July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the chance we have now will probably never return within a generation, if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution & the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing farther truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years,—and during these years we *must* support him and keep him in his work. The Indian Govt. *can't* do this and *won't* do this. They have refused his prayer for extention, and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion!

I am sure you will be able to guess, as well as I,

what his expenses here are likely to be. He has to keep an assistant on about £ 200 a year, his instruments and appliances will cost about as much, and living with his wife in this country & travelling from place to place,—to Germany or America sometimes,—will cost at least £ 600 a year.

Thus a thousand pounds a year,—(or 15,000 Rupees) is what is absolutely necessary for him ;— I believe Sir M. Bhownagree gets about three times as much for his political work ! Will our country fail to give our only scientist this support when so much is at stake, when a chance now lost may never come back to us ?

From past bitter experience, I would not depend on annual collections and contributions. As a friend, I would not advise Dr. Bose to give up his appointment,—miserable as it is,—depending on annual remittances. We must make him independent once for all, so that there may be no doubt as to his future, so that he may devote his whole time and energies to his work without any uncertainty in his prospects. I do not know how much money an Insurance Office would require in order to grant Dr. Bose an annuity of Rs 15,000 a year for the rest of his life. I imagine they would want two lakhs or so ;— and unless we can find this sum and pay it into an Insurance Office to assure an annuity to Dr. Bose during the rest of his life I see no other way of making him independent of that drudgery, humiliation and eternal worry which are certain to ruin his chances and our country's

prospects for ever.

The suggestions I have made in this letter are all my own. I feel strongly in the matter, and have thought it out, and made my own calculations. And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,— we shall lose our chance for ever and deserve to lose it. I know, Robi, you feel as strongly as I do; you have immense influence in the country; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money & invest it in the manner proposed for the honour & the glory of our country.

Yours Ever Sincerely
Romesh Dutt

Bose Para Lane
Baghbazar.
Calcutta. Friday
June 16, 1899.

My dear Mr. Tagore,

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards wh. I had been steadily pressing for so long! I was within a day or two of

writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed !

I am really not at all happy to be going away from India— even for a little while— and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying— & if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs. Tagore & my love to your charming children.

And believe me dear Mr. Tagore

Sincerely Yours,
Nivedita

9, Elysium Row,
Calcutta.
April 18th, 1903.

Dear Mr. Tagore,

You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, & of the difficulties under which he had laboured in making them. But I imagine that you only want the kind of account that I can give you in a letter. I imagine, too, that in writing you a letter I am making a more or less confidential communication, so that I need not fear to use names occasionally knowing that I shall not be quoted in any public way.

When I came to Calcutta I first knew Prof. & Mrs. Bose, in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to continuous annoyances & petty difficulties—with the evident earnest desire of those who were about him to end his distinction which was personally galling to them. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence & flagrant misrepresentation.

These things may seem small in your eyes, but if you have the least idea (as you must have) of how impossible it is to do work requiring great insight or great & sustained emotion, unless there is freedom & peace, you will know how wonderful it is that

our friend should have continued to work on & achieve, in spite of his surroundings at-that time. If one could also realise, in a country situated as India is, the sacrifices that a free people, like the Americans or English, the French or the Germans wd. be willing to make in order to obtain such a worker as Dr. Bose —of their own blood— one wd. stand amazed, as I did, at the spectacle of a great scientific man working alone as he was. I had come, of course, from Europe, where Prof. Bose's name was well known as the discoverer of the Etheric Waves that penetrate minerals. His work was belated in reaching Europe. It was announced along with the Rontgen rays, & obviously went deeper— since that form of light was deterred by bone & metal, while *his* penetrated these substances. Already, early in the year 1895, I believe, he had demonstrated the existence of these invisible rays at the Town Hall, Calcutta— and it was not till two years after he had thus made the essential discovery— as some of the Italian scientific papers were the first to point out,— that Marconi began to work out & apply it on the large scale.

Of course you understand that men of the inventor & discoverer type— men like Marconi, Tesla, Mascine*, & so on,— rank in the world of science far below the investigator, the man of Sannyasin mind like Dr. Bose, who pursues knowledge for its own sake. Even Prof. ... jeopardises his great reputation, & certainly minimises his historic importance by taking patents & becoming involved

* Mascart ?

in commercial schemes. But Dr. Bose not only demonstrated the existence of these particular etheric waves. He proved himself as great in constructive ability as in research itself, & his instrument, popularly known as the Artificial Eye, was considered a marvel of compactness & simplicity. Prince Kropotkin was talking of how Prof. Thomson the week before at the Royal Institn. had exhibited an apparatus some yards long, to act as a polariser of light— and Prof. Bose, the following week, to do the same thing, simply took up a book (it happened to be a Bradshaw) & showed how the rays wd. pass one way & not the other. "I said to myself", said Prince K, "that this was the simplicity of the highest genius." But of course Prof. Bose was only able to perform this great simplification of methods because *his* theory was so much more sound than those of his English & German competitors in this field.

He began to publish Papers through the Royal Society in, I think, the year 1894. From that date, working under all his difficulties as he was, he published 2 or 3 every year till he left for Paris in 1900. (One Paper in 2 years is considered a good record for a life that is surrounded by advantages.) And Prof. Bose's work was in each case completely original & in a special sense accurate & exhaustive. He was like a man haunted by the fear that if he failed at any point his people wd. be held to have no right to education. "Everyone knows that we have brilliant imagination" he told me, when he was fighting against death in

London in 1900, & still struggling to make a record of his latest discoveries, "but I have to prove that we have accuracy & dogged persistence besides." He did prove it. Lord Rayleigh & Sir Wm. Crookes both told him that while the perfection of his methods was unquestioned, no one had yet been able, in 1901, to repeat his experiments of 1895-6 ! His manipulation was beyond rivalry.

The work of '94 to 1900 had consisted of some dozen or more separate investigations on invisible light-polarisation. The existence of a dark cross— &c. &c.— these were valuable pieces of work, full of suggestions to some of the advanced workers in Europe, who were not slow to take hints from his instruments & theories. It was apparently in the year 1900, however, that all these separated tasks began to combine in a series of great generalisations which have not yet been given to the world in their completeness, and which are to prove of wider & wider philosophic interest as time goes on.

I allude to the great Theory of Stress & Strain— which, if only he can command time & strength to work it out in publication, will be held as epoch-making as Newton's Law of Gravitation— a tribute worthy of India's contributing to world-knowledge.

It is the minor applications of this generalisation that have hitherto attracted so much attention— one of the first discoveries to which it led was that of the Binocular Alternation of Vision.

Another was of a more practical (i.e. commercial)

nature— leading to the improvement of the coherer in Wireless Signalling, & Lodge's collaborator, Dr. Muirhead, freely confessed that in the development of the system lately adopted for India, they had owed most important suggestions to Dr. Bose's Papers & conversation. The largest applications of the theory are however purely scientific. It gives an immediate clue to whole classes of apparent anomalies in photography, in chemistry, & in Molecular Physics generally. Amongst other things it led to the immediate discovery & formulation of the phenomenon known as Vegetable Response. In realms like these it has disproved the contentions of many would-be theorists of a smaller scale, & there is therefore a strong opposition to Prof. Bose's work amongst those physiologists who have tried to prove the unique character of life. This opposition is of course perfectly normal. It is usually in fighting against it, that a scientific man proves his greatness, & conquers those who disagree with him. But in this case, there is a strong race-feeling of jealousy to combine with the natural & necessary scientific opposition, & I have no doubt that it was through the efforts of these men at the India Office that the opportunity was taken to refuse Dr. Bose any extension of deputation, at the moment when his opinions began to be known, & before his book had yet come out.

It was the very man of whom I have this suspicion who in November, believing Prof. Bose to be in India, (to have been forced back to India indeed) stole some

of his results & published them as his own. Fortunately Prof. Bose's position in the world of Science was too well assured for him to touch it, & though he has been able to organise a small party, we may regard it as easily discredited if the work can only be continued in an adequate way.

The book on Response in Living & Non-Living is now triumphant. I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanishads & pronounced it one, shall again survey the vast accumulations of physical phenomena which the 19th Century has observed & collected, & demonstrated to the empirical, machine-worshipping, gold-seeking mind of the West that these also are One— appearing as Many.

But I recognise that under present conditions one cannot even ask for the beginning of such a work. The petty daily persecution where perfect sympathy & every facility are absolutely necessary : the distracting routine of a paid servant who is never allowed to feel independent of daily bread, the constant difficulties thrown in the way by minor officials who have power enough to impede, but not enough to be raised above jealousy,— are these things not enough ? And then we ask him to undertake great work— but what are *we* willing to do for *him* ? Can we supply him with companions in learning who will stimulate & encourage the arduous work ? Does it trouble us that he

is the one man in India doing work of the first rank, & that to this day he is paid less than *any* Englishman, even the commonest, wd. receive in his place ?

Dr. Garnett of London told me of the splendour of the great College of Sciences at Vienna, and how, when he exclaimed as to its cost, the government representative replied proudly that if *one* scientific man shd. be produced in a century there, it wd. be more than worth their while. Which of us feels like this ?

Ah India ! India! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,— not to sit at ease, but— to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest ? And if you cannot do this— if you cannot even bless your own child & send him out equipped, then,— is it worthwhile that the doom should be averted, & the hand of ruin stayed, from this unhappy & so-beloved land ?

This is all very inadequate, dear Mr. Tagore. But I have used many sheets of note-paper I see— & I must draw my letter to a close.

Ever yours faithfully
Nivedita
of Ramakrishna-V.

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২ নভেম্বর ১৯০০)—

'তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।'[১]

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও জগদীশচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩৭) সৌহার্দ্যের বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখিয়াছেন[২]—

Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest... has been that with the poet Rabindranath Tagore. On the occasion of Bose's return [April, 1897[৩]] from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life...

রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্যের এই সূচনাকালের কোনো চিহ্ন পত্রাকারে

১ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৪১২

২ Patrick Geddes, *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose* (1920), p. 222

৩ '১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বসু মহাশয় ভারতে প্রত্যাগত হন।' —জগদানন্দ রায়, 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' [১৩১৯], পৃ ৫

রক্ষিত হয় নাই; একমাত্র নিদর্শন 'কল্পনা' গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'জগদীশচন্দ্র বসু' ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে') কবিতা। বর্তমান গ্রন্থের সূচনায় পুনর্মুদ্রিত এই কবিতাটি মাঘ ১৩০৪ সংখ্যা প্রদীপ পত্রে 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়; রচনাশেষে তারিখ আছে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯ জুলাই ১৮৯৭)।

১৮৯৯ সাল হইতে উভয়েরই অনেকগুলি পত্র রক্ষা পাইয়াছে; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। জগদীশচন্দ্রের অধিকাংশ চিঠি প্রবাসী পত্রে[১] প্রকাশিত হইয়াছিল; অপ্রকাশিত কয়েকখানি পত্র রবীন্দ্রসদনে আছে। উভয় পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষা পায় নাই বা আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রবাসীতে জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর প্রকাশ সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়।[২]

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি চিঠি প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] এইসকল পত্র 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠিও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল; উহার প্রথম ছয়খানি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত।[৪] রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অবলা বসু মহোদয়ার চিঠিপত্রও প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।[৫]

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-পৌষ, ১৩৩৩
২ প্রবাসী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৩
৩ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪ - আষাঢ় ১৩৪৫
৪ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪, শ্রাবণ ১৩৪৫
৫ প্রবাসী, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, বৈশাখ ১৩৩৪

পত্র ১। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'কথা' (প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬— ইহার অনেক-গুলি কবিতা ১৩০৬ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত হয়) এবং 'কাহিনী' (প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬)। কথা কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত।

তুলনীয় জগদীশচন্দ্রের পত্র (২০ মে ১৮৯৯, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)—

'আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? ·· মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।' [১]

জগদীশচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই পত্রেই তিনি লিখিতেছেন—

'একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা

১ 'বাল্যকালে এবং পরবর্ত্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই·· মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে' এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশচন্দ্র ৭. ৯. ৩৩. তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্ত্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।'— বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।'

এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" রচনা করেন (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬)।

পত্র ২। 'সেই অর্দ্ধশ্রুত গল্পটি…আস্তে আস্তে লিখি'

এই গল্পটি 'চোখের বালি' হইলেও হইতে পারে। ২৬ শ্রাবণ ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে[১] 'চোখের বালি'র ('বিনোদিনী'র) যেরূপ উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশ লিখিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে 'চিরকুমার সভা'ও ঐরূপে লিখিত ও ভারতী পত্রে ১৩০৭ বৈশাখ হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়; তবে এই ক্ষেত্রে 'মাসিক পত্রের তাড়া' যথেষ্টই ছিল।

পত্র ৩। ১০ আষাঢ় ১৩০৬ (২৪ জুন ১৮৯৯)। 'আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।'

দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২১ জুন ১৮৯৯ (৭ আষাঢ় ১৩০৬)—

'আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। আপনার সুখ ও উৎফুল্লতার সময় সহভাগী করিয়া যেরূপ সুখী করেন, অন্য সময়ে স্মরণ করিলে বন্ধুতার নিদর্শন দেখি।

'আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদককে এতৎসম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে এরূপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই

১. প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৮৩

সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি লিখিব কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চে আছেন; এসব কর্দ্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

'আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাহারা কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বচন কি আপনার নিকট পৌছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই।... বৃহত্তর জীবন আপনার জীবনকে পরাস্ত ও অধিকার করিয়াছে।'[১]

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ আষাঢ় ১৩০৬, ২১ জুন ১৮৯৯)—

'ক্রুদ্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।'[২]

প্রিয়নাথ সেন ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর পাইয়া, রবীন্দ্রনাথ যেদিন জগদীশচন্দ্রকে আলোচ্য চিঠিখানি লিখিয়াছেন সেইদিন (১০ আষাঢ় ১৩০৬) প্রিয়নাথ সেনকেও লিখিতেছেন—

১ রবীন্দ্রনাথ যে পত্রে 'গল্পের কথা' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাওয়া যায় নাই। ৪ আষাঢ় ১৩০৬ তারিখের পত্রেই এই গল্পের প্রসঙ্গ ছিল, প্রবাসীতে মুদ্রণকালে ঐ প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়াছে, এরূপও হইতে পারে। মূল পত্রখানি এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

২ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫

'আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শান্তিলাভ করি।— মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ; — দুঃখ বেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজের মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে।'[1]

জগদীশচন্দ্রের চিঠি উল্লেখ করিয়া ঐ পত্রেই লিখিতেছেন—

'ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;— বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত— তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।'

পত্র ৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল ; ইঁহার ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা সঞ্চার করেন 'ইতিহাস' গ্রন্থে তাহার প্রভূত নিদর্শন সংকলিত আছে। অক্ষয়কুমার রেশমশিল্পে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে ঐ শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্‌যোগী ছিলেন—

১ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫-৭৬

রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়েও তাঁহার আলোচনা চলিত।[১] অক্ষয়কুমার রাজসাহী শিল্পবিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন, এই বিদ্যালয় হইতে রেশমের কাপড় কিনিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদেরও উপহার দিতেন— 'বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার।'[২]

রবীন্দ্রনাথও এই সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা কল্পনায় ও পরীক্ষায় উৎসুক, সেই সূত্রেই 'রেশমের গুটি'র অভ্যাগম।

পত্র ৩। লরেন্স্।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক[৩], পরে শান্তিনিকেতনেও অধ্যাপক ছিলেন। 'এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না।'[৪]

রেশমের চাষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—

'লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের

১ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ ২৬৭

২ মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৩০ চৈত্র ১৩০৫। রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা [১৩৪৮], পৃ ১০৭

৩ 'আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।··· ১৮ই ভাদ্র ১৩০৮' —মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ ১০৮

৪ রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৭ পৌষ ১৩৫৮ সংস্করণ, পৃ ৪০

নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন।...

'লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; ...চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে

জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো ; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে।'[১]

দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের এই চেষ্টায় "প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়" রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে কী পরিমাণ যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা এই বিবরণে উল্লিখিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের পত্রে দেখা যায়, তিনিও, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই, এই সময় রেশমের কীট -পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পত্র ৩। 'চাষ-বাসের কাজ।'

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারিতে বাস করিতেছিলেন। ইহারও পূর্বে, জমিদারি-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, 'দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের' 'যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক' বলিয়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন, 'এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভর-পর সরল চাষাভুষোদের' অক্ষম অবস্থা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।[১] — রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বারংবার বিফলকাম

১ পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৪১-৪৩।

১ ছিন্নপত্র গ্রন্থে ২১ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখের পত্র। অপিচ ১০ মে ১৮৯৩ তারিখের পত্রে দ্রষ্টব্য—

'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখ্‌লে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না

হইয়াও পল্লীমঙ্গলের যে উদ্‌যোগ ও আয়োজন করিয়াছেন আলোচ্য সময়ে 'চাষ-বাসের কাজ' তাহার একরূপ সূচনা বলা যাইতে পারে—

'শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টি‍ঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও … পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন।'[১]

পত্র ৩। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন; ১৩০৪ সালে (১৮৯৭) তিনি তাঁহার 'বিরহ' নাটিকা 'কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে' এইভাবে উৎসর্গ করেন— 'বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির

দিলে এদের আর গতি নেই।… সোশিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড় নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগা। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌ কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে।'

১ পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩৯-৪০

পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল'। রবীন্দ্রনাথ এই কালে দ্বিজেন্দ্রলালের নিম্নোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রশস্তি রচনা করেন— আর্যগাথা, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩), ১৩০১ অগ্রহায়ণ সাধনা পত্রে; আষাঢ়ে (১৮৯৯), ১৩০৫ অগ্রহায়ণ ভারতী পত্রে; এবং মন্দ্র (১৯০২), ১৩০৯ কার্তিক বঙ্গদর্শন পত্রে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধনা-সম্পাদকরূপে 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগেও, মাসিক পত্রে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকাশ্য সূচনা 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় প্রকাশের পর। এই সৌহৃদ্য ও বিচ্ছেদের বিবরণ দেবকুমার রায় চৌধুরী -প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থে ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন।

পত্র ৪। এই পত্রে সাল লিখিত নাই, তারিখ ও মাস (১ আশ্বিন) উল্লিখিত আছে; ১৩০৭ সালে লিখিত বলিয়া অনুমিত। এই পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিত -কৃত ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই'এর অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহা ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হয়, রচনার তারিখ দেওয়া আছে ভাদ্র ১৩০৭।

১৯০০ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত ইন্‌টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট্‌স্'এ আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দেন (আগস্ট্ মাসে) ও Response of Inorganic and Living Matter সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ

করেন।[১] তথা হইতে লণ্ডনে গিয়া জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন (৩১ আগস্ট ১৯০০) তাহাতে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্যারিস ও লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের এই পত্রের উত্তরেই লিখিত—

'একদিন [প্যারিস] Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary… আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (butএর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited— শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congressএর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।…

'এই গেল প্যারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার

১ গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৮৮

নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন…

'কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।'

পত্র ৪। 'লর্ড রবার্টসের মত… প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্‌মাস করতে পারবেন।'

১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে; ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রবার্ট্‌স্‌ বিশাল বাহিনী লইয়া রাজধানী প্রিটোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৯০০ সালের ৫ জুন প্রিটোরিয়া অধিকৃত হয়।

পত্র ৪। 'আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট'

জগদীশচন্দ্রের যে পত্রের (৩১ আগস্ট ১৯০০) উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, তাহাতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার -প্রসঙ্গে কোনো বিজ্ঞানীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন 'এত Surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না— it is

human nature, A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়'— এই পতন-অভ্যুদয় জগদীশচন্দ্র চিঠিতে চিত্রিত করিয়াও দেখাইয়াছিলেন। তাহারই অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে, জগদীশচন্দ্র বিদেশে উদ্যম-উদ্দীপনার উচ্চবিন্দুতে, রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে 'নিশ্চেষ্ট'তার নিম্নবিন্দুতে।

পত্র ৪। 'Sketch Book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি।'

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৩৩৫); কিন্তু প্রথমজীবনেও চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন, একান্তে কখনো কখনো এ বিষয়ে চর্চাও করিয়াছেন। আলোচ্য পত্র লিখিবার সাত বৎসর পূর্বে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লিখিতেছেন—

'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ।… লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বল্‌তে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্ব্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ [১৩০০]

ইহারও পূর্বে চিত্রচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে—

'মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-

মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।'

এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গানগুলির প্রকাশ-তারিখ হইতে মনে হয় যে, সম্ভব ইহা ১৮৮৫ (১২৯২) বা তাহার কাছাকাছি সময়ের কথা।

পত্র ৪। 'আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত'

এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় চার বৎসর পরে। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সুহৃদ্‌বর্গসহ বুদ্ধগয়া যান। ভগিনী নিবেদিতাও এই সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ("Sister Nivedita as I knew her", Hindusthan Standard, Puja Annual, 1952) এই ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

Early in the month of October, 1904, Nivedita, Dr. Jagadish C. Bose, Rabindranath Tagore, Swami Sadanand (Gupta Maharaj), Brahmachari Amulya (now Swami Shankaranand) went to pass a week at Bodh Gaya. I was invited and joined them from Patna. We were lodged in the *mahant's* guest-house.

There were daily readings from Warren's *Buddhism in Translations* and occasionally Edwin Arnold's *Light of Asia* ; some songs and recitations by the Poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character. Fuji, a poor Japanese fisherman had

by hard austerity for many years, saved money to gratify his life's dream of making a pilgrimage to the spot where the Blessed One had attained to Enlightenment. He had at last come here and lived frugally in a room of the pilgrim house. Every evening he would come and sit under the Bodhi Tree praying and chanting the hymn—

Namo namo Buddha Divakaraya,
Namo namo Gotama-Chandimaya,
Namo namo Nanta-Gunannabaya,
Namo namo Sakya-Nandanaya.

In the silence and gloaming the Sanskrit (Prakrit) words uttered with a Japanese accent, rose like the tolling of a low bell, which made us feel as if overpowered by the spirit of the place. Words were not uttered ; it was beyond speech.

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn,[১] and when he wrote his play *Natir Puja* he took care to insert it as Shrimati's prayer. Fuji had given the hint.

পত্র ৪। 'লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল··· নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি।'

সম্ভবতঃ লোকেন্দ্রনাথের উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই, এই কাব্য-

১ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই জাপানী ভক্তের কথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরেও স্মরণ করিয়াছেন, ১৩৪২ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতা শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণে। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত বুদ্ধদেব (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) পৃ ২০-৩

চয়ন প্রকাশিত হয় নাই ; 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয় অনেক পরে (১৯০৯), কবির তরুণ অনুরাগীগণ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভবত এ বিষয়ে উদ্‌যোগী ছিলেন। সম্প্রতি একখানি 'কাব্য-গ্রন্থে' (১৮৯৬) কবির হাতের নানা সম্পাদনা লক্ষ্য করিয়াও মনে হয়, তিনি 'নিজেই এ কাজে হাত' দিয়াছিলেন, যদিও তাহা সমাধা হয় নাই। এই সম্পর্কে ৬-সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪। 'আর্যা।' তুলনীয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের চিঠি— 'Mrs কথাটা বাংলাতে অতি বীভৎসজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন।'

পত্র ৪। 'শ্যালকজায়া আর্যা সরলা' সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা।

পত্র ৪। 'শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত।··· আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা'হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।'—

'ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

'এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

'তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সম্পাদকের নিবেদন', [শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত] সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'সংস্কৃত পাঠ', দুই খণ্ডে, ১৮৯৬ সালে 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (অচলিতসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ৪। 'আপনার জন্যে পুরীর জমীটি'

পুরীতে রবীন্দ্রনাথের 'জমি ও গোটাকতক ঘর' ছিল। জগদীশচন্দ্রকে এই জমি রবীন্দ্রনাথ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১৮ আগস্ট ১৯০৩)—

'তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব।… তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঋণমোচনের জন্য অবশেষে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।[১] এই প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় তবে সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট বলিতেছিলেন … পুরীতে জমি কিনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকে দিয়া … নিকট যাচাই করিতে পার?'

১ 'সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।' —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬৯

পুরী এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে; জগদীশচন্দ্রকেও পুরীতে সঙ্গীরূপে পাইবার জন্য তাঁহাকে এখানে গৃহ-নির্মাণে তিনি উৎসাহিত করেন। জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে (২১ জুন ১৯০০) রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

'পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে। সমুদ্রগর্জ্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে। এই সংকীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজকে হারাইতে চাহি।'[১]

পত্র ৫। 'সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে?'

একাধিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-অর্জন প্রসঙ্গে সীজারের কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ২০-সংখ্যক পত্রেও লিখিয়াছেন 'সীজারের নৌকা কখন ডুবে না'। সীজারের বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত, 'উষ্ণমণ্ডলবাসী' জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তাও সেকালে সেইরূপ অলোকসামান্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল— 'ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন', 'ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে।' 'সীজারের নৌকা' প্রসঙ্গে বোধ করি নিম্নলিখিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিতেছিল[১]—

At Apollonia, since the force which he had with him was not a match for the enemy and the delay of his troops on the other side caused him perplexity and distress, Caesar conceived the dangerous plan of embarking in a twelve-oared boat, without any

১ ইংরেজি উদ্ধৃতি শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

one's knowledge, and going over to Brundisium, though the sea was encompassed by such large armaments of the enemy. At night, accordingly, after disguising himself in the dress of a slave he went on board, threw himself down as one of no account, and kept quiet. While the river, Aous was carrying the boat down towards the sea, the early morning breeze, which at that time usually made the mouth of the river calm by driving back the waves, was quelled by a strong wind which blew from the sea during the night; and the river therefore chafed against the inflow of the sea and the opposition of the billows, and was rough, being beaten back with a great din and violent eddies, so that it was impossible for the master of the boat to force his way along. He therefore ordered the sailors to come about in order to retrace his course. But Caesar, perceiving this, disclosed himself, took the master of the boat by the hand, who was terrified at sight of him, and said: "Come, good man, *be bold and fear naught; thou carryest Caesar and Caesar's fortune in thy boat.*" The sailors forgot the storm and laying to their oars, tried with all alacrity to force their way down the river...

পত্র ৫। 'আমার সমস্ত ছোটগল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে।'

ইহাই প্রথমসংস্করণ গল্পগুচ্ছ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত; প্রথম খণ্ড ১ আশ্বিন ১৩০৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১১ অক্টোবর ১৯০০) তারিখে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৭ [১৯০১] সালে প্রকাশিত।

পত্র ৫। 'আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে'

জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রচারে উদযোগী হইলেও সে চেষ্টা তখন সার্থক হয় নাই। ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।'

জগদীশচন্দ্র পুনরায় এ বিষয়ে ১৯০০ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisherরা ফাঁকি দিতে চায়।

সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?[১] আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

'এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।'

১৯০১, ১৬ জানুয়ারি তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৬টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি:—

'প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা— সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটী" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

'দ্বিতীয়— Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না— ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে,

১ জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র [১২ ডিসেম্বর ১৯০০]—'আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।'

এরূপ দু-একজনকে আমি জানি— true to life। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

'তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির[১] সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব; ইহার জীবন অতি আশ্চর্য্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়— ইয়োরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European Literature.

'সুতরাং সাধারণের নিকট কিরূপ লাগিবে জানি না।

'কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখানকার একজন publisherএর নিকট পাঠাইতে চাই। এদেশীয় publisher চোর। অনেক দর-দস্তুর করিতে হইবে। প্রথমে লোকসান পূরণের জন্য টাকা চাহিবে।

'অথবা কোন Magazineএ পাঠাইতে পারি।'

পুনরায় ঐ বৎসর ২২ মে তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?'[২]

কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে বাসকালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন তখন এই কড়ার থাকিত যে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ

১ সম্ভবতঃ Prince Kropotkin

২ বর্তমান প্রসঙ্গে প্যাট্রিক গেডিস পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ২২৩) লিখিয়াছেন—

Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe, and Bose felt keenly that the West had not the opportunity of realising his friend's

একটি গল্প রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিবেন।[১] জগদীশচন্দ্রের একখানি চিঠিতে দেখি (১৮ এপ্রিল ১৯০০), তিনি শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া তাঁহার 'পাওনা' আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন—

'আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্ততঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।'

জগদীশচন্দ্রের অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সকৌতুক উল্লেখ অনুপ্রবিষ্ট— 'আমি এ কয়দিন "মেঘ ও রৌদ্রের" মধ্য দিয়া গিয়াছি। মেঘের মধ্যে রজতরেখা কখন কখন দেখা দিয়াছে' (৬ মার্চ ১৯০০)। 'দেখিবেন সদরের অনুগ্রহে যেন আমি অন্দরের বিরাগভাজন না হই' (১৬ মার্চ ১৯০০)। 'তোমার মিনির বিবাহ হইল। কাবুলীওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে' (১১ জুলাই ১৯০১)।

greatness. So during his second visit to England, in 1900, he had one of his stories, 'The Kabuliwalla', translated into English. Prince Kropotkin— a good critic in letters as well as science—declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen ; and Bose submitted it to *Harper's Magazine.* It was declined, because the West was not sufficiently interested in Oriental life ! The time had not yet come : but Bose during his last visit to America in 1915, when Tagore's fame was reaching its meridian, did not fail to utilise the opportunity to rub this in when Harper was publishing one of his own articles.

১ Once, on receiving an invitation from the poet to stay with him at his house at Silaida on the river Padma, Bose accepted it with the demand of the fullest and highest hospitality his friend could render him— that of a new story to be written every day, and read to him every evening !— গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২২২

রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়' গল্প জগদীশচন্দ্রকে কিরূপ উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিতে (৩০ আগস্ট ১৯০১) তাহার উল্লেখ আছে—

'তোমার 'জয়পরাজয়' গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুসনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইতেছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয় পরাজয় আমার নিকট একই।'

এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে (৩০ নভেম্বর ১৯১৭) 'নিবেদন'এর পরিসমাপ্তিতে বলিলেন—

'যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপে পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।'[১]

পত্র ৫। 'ত্রিপুরার মহারাজ…পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।'

৬, ১৭, ১৮ -সংখ্যক পত্রেও এই প্রসঙ্গ আলোচিত; বর্তমান খণ্ডে সংগৃহীত অন্য কোনো কোনো পত্রে এবং প্রবন্ধেও এই প্রসঙ্গ আছে। ত্রিপুরার মহারাজার নিকট হইতে জগদীশচন্দ্র যে আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তৃতায়[২] সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রাধাকিশোরের এই যোগাযোগ সাধন

১ জগদীশচন্দ্র বসু, 'অব্যক্ত'

২ মহিমচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক তাঁহার 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে The Englishman পত্রিকা হইতে উদ্‌ধৃত।

করিয়াছিলেন প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ; জগদীশচন্দ্রের প্রতি আনুকূল্যবিধানের জন্য মহারাজকে রবীন্দ্রনাথ যেরূপ বারংবার প্রবর্তিত করিয়াছেন সে কথা, রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি এইখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেই প্রকাশ। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ...১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়।... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, "...যদি তুমি পার উপস্থিত হইও।"... মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।... রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।...

'তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০৲ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০৲ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া

বলেন, "এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব।..." তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—"বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দুএক পদ অলঙ্কার নাই বা... হইল"... [১]

'...তৎপর জগদীশবাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটী ফুরাইয়া আসায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত, এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ বাণী এবং ২০,০০০৲ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যলাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণে[২] সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[৩]

পত্র ৫। 'বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন ?'

ইহার কিছুকাল পূর্বে জগদীশচন্দ্র ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্রাড্‌ফোর্ড্ সভায় প্রবন্ধপাঠ (সেপ্টেম্বর ১৯০০) করিলে বৈজ্ঞানিক শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হন, এবং তাঁহার গবেষণা যাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে এজন্য তাঁহাদের কেহ কেহ জগদীশচন্দ্রকে ইংলণ্ডেই অধ্যাপনাকর্মে ব্রতী হইতে আহ্বান করেন। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে লিখিতেছেন—

'বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার stereoscopeএ

১ তুলনীয় "জগদীশচন্দ্র", বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২৬

২ পূর্বে উল্লিখিত বক্তৃতা

৩ মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা, "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ", দেশীয় রাজ্য ; ওই গ্রন্থের "ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধেরও কোনো কোনো বাক্য এই উদ্‌ধৃতির অন্তর্গত ।

MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others— all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

'তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ Universityর নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

'এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি— যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspirationএর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?'

জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা

জানেন, প্রথমজীবনে কর্মক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহু অনাবশ্যক বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকিতে হইয়াছে। বিদেশে যখন তাঁহার আবিষ্কার বিজ্ঞানীসমাজে গভীর ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে, তখনও পাশ্চাত্ত্যদেশে অনুকূল পরিবেশে তাঁহার গবেষণাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার ও তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ ও অবসর সামান্য পরিমাণে লাভ করিতেও তাঁহাকে প্রভূত বেগ পাইতে হইয়াছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বহু পত্রে জগদীশচন্দ্রের দ্বিধান্দোলিত চিত্তের উদ্‌বেগ প্রকাশিত হইয়াছে—

৫ অক্টোবর ১৯০০। 'জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।'

২ নভেম্বর ১৯০০। 'আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

'ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?...

'তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

'সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।...

'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

'...এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএর পূর্ব্বেই আমার ছুটী ফুরাইয়া আসিবে। ছুটী চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ।

'...এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে।

আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত।'

২৩ নভেম্বর ১৯০০। 'সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি; জানি না পাইব কি না।'

১০ ডিসেম্বর ১৯০০। 'আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, লিখিও।... আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।'

'ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে', 'বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমর বাণী উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত'— এই কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের মন এই সময় উৎফুল্ল, জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে তিনি 'সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি' সকল বাধা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া উদ্‌ভাসিত দেখিয়াছিলেন তাহা প্রবলভাবে তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল— জগদীশচন্দ্র 'নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত' করিবেন, তাঁহার সাধনায় ভারতবর্ষ আর-একবার 'গুরুর বেদীতে আরোহণ' করিবে, এই ভাবনা এই সময় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল— 'ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।'

অসময়ে জগদীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে এই যজ্ঞ পাছে অসম্পূর্ণ থাকে, এই কথা মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের যাত্রাপথ অনুকূল করিবার জন্য স্বীয় শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশায় রবীন্দ্রনাথ এই সময় জগদীশচন্দ্রকে

নিরন্তর উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিয়া এক দিকে তাঁহার মনকে অবসাদ ও দ্বিধা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টিত, অপর দিকে তাঁহার কর্মের আর্থিক ও আনুষঙ্গিক বাধা যাহাতে প্রবল হইয়া না উঠে সেজন্যও তিনি উদ্‌যোগী। তাঁহার নিজের অর্থসম্বল এ সময়ে ক্ষীণ, কিন্তু 'জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব'।[১] 'ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য'[১] এই কথা মনে করিয়া 'অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন'[১] দিয়া তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন; জগদীশচন্দ্রকে লিখিলেন, 'তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।'[২] ইহাও লিখিলেন, 'তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি?'[৩]

এই ব্রতোদ্‌যাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা, তাঁহার প্রসঙ্গে সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কিরূপ বাধাসংকুল, রবীন্দ্রনাথ পূর্বাবধিই সে কথা জ্ঞাত ছিলেন; জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক বুঝিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, জগদীশচন্দ্র এ দেশে থাকিয়াই স্বাধীনভাবে কাজ করুন— 'কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের ধিক্'।[৪] এ প্রস্তাব নানা কারণে জগদীশচন্দ্রের

১ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৩০
২ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৯ ৩ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪১ ৪ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৭

পক্ষে স্বীকারযোগ্য হয় নাই[১] ; অপর পক্ষে ছুটি পাইতে বাধা হইবার সম্ভাবনায়, বিলাতে থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ অকালে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ, ১২ ডিসেম্বর [১৯০০] তারিখের পত্রে, বিনা বেতনে জগদীশচন্দ্রের ছুটি লইবার প্রস্তাব করিতেছেন— 'যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি।'

৩ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অন্ততঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে জার্মেণী, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?'

উত্তরে ২১ মে ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো। …তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কী পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে।… যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী

১ জগদীশচন্দ্রের পত্র, ৩ জানুয়ারি ১৯০১, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩

September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটী দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না।'

উত্তরে ৪ জুন ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।'

২২ মে ১৯০১ তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'যদি আমার এদেশে অধিক দিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে আসিতে হইবে।'

ইহার পূর্বদিনই (২১ মে ১৯০১) রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন—

'আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি।'

জগদীশচন্দ্রের ২২ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন (৩ জুলাই ১৯০১)—

'তুমি যদি দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক্ একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।'

১৭ সংখ্যক পত্রে [সেপ্টেম্বর ১৯০১] রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার

তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্ম মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কা্লর রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে।'

পত্র ৬। 'লোকেনকে ··· পারা গেল না।'

বর্তমান প্রসঙ্গে ৫-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পের অনুবাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার তাঁহার কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল— Fruitless Cry ('নিষ্ফল কামনা') এবং The Death of a Star ('তারকার আত্মহত্যা') নামে এই দুইটি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রে যথাক্রমে ১৯১১ সালের মে ও আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'কণিকা'-অনুবাদ প্রভৃতি ইহার পরবর্তী-কালের রচনা বলিয়া মনে হয়।[১]

পত্র ৭। 'বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব।'

পরবর্তী পত্রেও এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত। অভিনয়পত্রী-অনুযায়ী ভারত সঙ্গীত সমাজে এই অভিনয়ের তারিখ ১ পৌষ ১৩০৭ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০০); পাত্রগণ—

রাজা গোবিন্দমাণিক্য	শ্রীঅটল কুমার সেন।
নক্ষত্র রায়	শ্রীঅমর নাথ বসু।
রঘুপতি	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
জয়সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র বসু মল্লিক।

১ দ্রষ্টব্য, Ramananda Chatterjee, Foreword, *The Golden Book of Tagore.*

মন্ত্রী	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।
চাঁদপাল	শ্রীভূত নাথ মিত্র।
নয়নরায়	শ্রীবেণীমাধব দত্ত।
গুণবতী	শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

এই অভিনয়ের তারিখ হইতেও ৭ ও ৮ -সংখ্যক চিঠিদুটির তারিখ অনুমানের সুবিধা হয়।

পত্র ৮। 'আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ?'

এ বিষয় জগদীশচন্দ্রের ৩০ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রে উল্লিখিত; তাঁহার ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্রেও এ প্রসঙ্গ আছে। এরূপ ও অন্যান্য তথ্য -অনুযায়ী ৮-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমিত। ৩০ নভেম্বরের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'আমাকে Society of Arts বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষীয় পুরাতন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলি। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চা আধুনিক ব্যাপার নহে। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা কিছু পার সংগ্রহ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবে।'[১]

পত্র ৮। 'শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা'

'শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত' 'ব্রহ্ম মন্ত্র' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় '৮ মাঘ ১৩০৭' তারিখে— অচলিতসংগ্রহ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

১ চিঠিখানির এক অংশ প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় নাই, উদ্‌ধৃতি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূলপত্রানুযায়ী।

পত্র ৮। 'চিরকুমার সভা।'

'চিরকুমার সভা' প্রথমে ভারতী পত্রে ১৩০৭ (বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র) ও ১৩০৮ সালে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়— প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত বিভিন্ন পত্রে[১] দেখা যায় বইখানি বিভিন্ন দফায় লিখিত; ১১ চৈত্র ১৩০৭ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন, 'কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি'।

পত্র ৮। 'বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি'[২]

জ্যামিতিচর্চা আযৌবন দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যসনস্বরূপ ছিল— সম্ভবতঃ এই বিষয়ের পাণ্ডুলিপি। এই চিঠির কিছুকাল পূর্বে (১৮৯৯) তাঁহার "দ্বাদশস্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি" প্রবন্ধ ১৩০৬ সালের ভারতী পত্রের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়— সম্ভবতঃ ইহাই বিদেশে 'যাচাই' করিতে পাঠাইয়াছিলেন। জ্যামিতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পত্রে (১১ অক্টোবর ১৯০১) জানা যায়—

'তোমার দাদার পুস্তক এখানকার এক Mathematical Societyর Secretaryকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ingenuityর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে

১ পূর্বোল্লিখিত প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

২ মূলপত্র পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বন্ধনীমধ্যস্থ শব্দ দুইটি, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় অর্থবোধ-সৌকর্যার্থ বন্ধনীমধ্যে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন বা জীর্ণ পত্রের শব্দ অনুমান করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। প্রবাসীতে 'বড় দাদা তাঁহার'-এর পর বন্ধনীমধ্যে 'পুস্তকের' এবং 'তাঁহার মতে ইহা'র পর বন্ধনীমধ্যে 'লেখাটা' এই শব্দ ছিল, ইহাও সম্পাদকীয় যোগ বলিয়া বোধ হয়; অর্থবোধের জন্য শব্দ দুইটি তেমন আবশ্যক বোধ হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। বন্ধনীভুক্ত astronomy শব্দটিও এইরূপ সম্পাদকীয় যোগ হইতে পারে।

নূতন notation বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি পাঠাই। এখানে Conservation সব দিকেই বেশী, যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নূতন সংজ্ঞা প্রচলিত করিতে না পারেন, তবে তাহা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে চাহে না।...'

পত্র ৯। এই পত্র সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত। জগদীশচন্দ্র ১০ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্রে 'আগামী কল্য Operation হইবে' এই সংবাদ দিয়া ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে লিখিতেছেন, 'আরও চার সপ্তাহ্ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।' রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ।' রবীন্দ্রনাথ যে এই পত্রে লিখিয়াছেন 'তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ— সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়', এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা জগদীশচন্দ্রের ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্রে আছে।

পত্র ১০। 'মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি।'

ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ১৪ বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখিতেছেন—

'আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম।... হিমালয়ের মহান্ সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও

দুচারখানা সঙ্গে আনিতেছি।... ২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকাল বেলা অনুমান ৪॥টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে যাইতে পারি।'[1]

এই ব্যবস্থানুযায়ী নির্দিষ্ট দিবসে রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় দার্জিলিং গিয়াছিলেন ধরিয়া লইয়া এই চিঠির তারিখ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১০। 'বেলার বিবাহ'

এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ় ১৩০৮; দ্রষ্টব্য শ্রীঅনুরূপা দেবী, "মাধুরীলতা", প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৮। শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবীও যতদূর স্মরণ করিতে পারেন, এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ়। ১৩০৮ সালে ১ আষাঢ় বিবাহের শুভদিনও ছিল।

পত্র ১০। 'তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই?'

জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁহার বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা গল্পের চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ তাঁহার চিঠিতে কখনো কখনো জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-সাহায্যে জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম বিনা তারে বার্তাপ্রেরণের সূচনা করেন— রবীন্দ্রনাথ তাহারই কথা এখানে ইঙ্গিত করিতেছেন।

পত্র ১০। 'বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে।'

১৩০৮ বৈশাখ হইতে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮-১২ এই পাঁচ বৎসর কাল ইহার সম্পাদনা করেন।

পত্র ১০। 'মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।'

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য পূর্বোক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথকে

১ এই পত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

লিখিতেছেন—

'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। ...আমার মতে আপনি অগৌণে ও অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।'

রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।[১]

পত্র ১১। 'পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায়... বের করেছ'

কৃত্রিম চক্ষুর উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়িলে তাহাতে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিতে থাকে তাহার মূলে আছে এই চক্ষুর ভিতরকার পদার্থের আণবিক পরিবর্তন; জগদীশচন্দ্রের এই মত যখন জয়যুক্ত হইল তখন তিনি স্থির করিলেন যে, আণবিক পরিবর্তন অন্য রকম উত্তেজনায়ও হইতে পারে, আর তাহাও সাড়ারূপে দেখা দিবে।

তিনি জড়ের উপর মাদকদ্রব্য, ক্লোরোফর্‌ম্‌ প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিলেন, তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জড়কে 'চিমটি' কাটিলেন, অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে; চিমটির পরিমাণ ও তীব্রতা মাপিবারও ব্যবস্থা করিলেন— অনুরূপ সাড়া পাইলেন। এমন সব যন্ত্র তিনি নির্মাণ করিলেন যাহা চালাইলে জড় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়ালিপি আপনা হইতে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তিনি দেখাইলেন যে, একখণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা, ব্যাঙের একটি পেশী বাহিরের

১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৩২-৩৩

উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়।[১] এই-সকল পরীক্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

পত্র ১১। 'আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম …দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কারসহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম।' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় খণ্ডে এই যাত্রার দিনলিপি আছে। ২২ আগস্ট ১৮৯০ বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন, ১০ সেপ্টেম্বর লণ্ডন পৌঁছান, ৯ অক্টোবর লণ্ডন ত্যাগ করেন।

পত্র ১১। 'বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে।' নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা। প্রকাশ-তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১৫ মে ১৯০১, অর্থাৎ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮।

পত্র ১২। এই পত্র জগদীশচন্দ্রের ১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এইরূপ অনুমান স্বচ্ছন্দেই করা যাইতে পারে। ১৯০১ সালের ১০ মে রয়াল ইন্‌স্টিট্যুশনে জড় ও জীবে সাড়া (On the response of inorganic matter to stimulus) সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন; বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উহা বিশেষ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে। এই বক্তৃতায় 'জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।'[২]

১ এই প্রসঙ্গে, পরিশিষ্টে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "জড় কি সজীব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ইহাতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাত। অপিচ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ৩ মে ১৯০১ তারিখের চিঠি।

২ রবীন্দ্রনাথ, জড় কি সজীব, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১১৬

এইদিন (৪ জুন ১৯০১) রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণীকেও অভিনন্দনজ্ঞাপনপূর্বক পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্র ১২। 'আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ।'

জগদীশচন্দ্র যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা আলোকের সমধর্মী অথচ দৃশ্য নয়, সেই অদৃশ্য আলোকের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিতেছেন।[১]

পত্র ১৩। 'আমার কন্যার প্রতি তোমার উপহার।'

সম্ভবতঃ Joan of Arc-এর জীবনী।[২]

পত্র ১৩। 'আমি সাহসে ভর করিয়া··· তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি'

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কেবল উৎসাহবাণী প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-রূপে স্বয়ং তাঁহার বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালী পাঠকসমাজে প্রচারে উদ্‌যোগী হন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা দুইটি ("আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা",[৩] বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮; "জড় কি সজীব ?", বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮) বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'তুমি যে গত মাসে আমার কার্য্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে

১ এই টীকা এবং ১০ ও ১২ -সংখ্যক পত্রে যথাক্রমে তারহীন বিদ্যুদ্‌-যান ও অদৃশ্য কিরণ সম্বন্ধে টীকা, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -লিখিত।

২ দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, ১৪ জুন ১৯০১, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৩

৩ ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'জগদীশচন্দ্র বসু' মুদ্রিত হইয়াছিল।

তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে, বাঙ্গলা কোন মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্য্যসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে-ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনদিন প্রস্ফুটিত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব।'

বন্ধু ও আত্মীয় -মণ্ডলীকেও রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা -প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী জগদানন্দ রায় এই সময় ধারাবাহিকভাবে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা "অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার", ভারতী ১৩০৭, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক।[১] রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা ভারতী পত্রে "বিলাতে অধ্যাপক বসু" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" রচনা মুদ্রিত হয়; রামেন্দ্রসুন্দরের অপর একটি রচনা, "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার", ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্র ১৪। ইহা জগদীশচন্দ্রের ৬ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এরূপ মনে হয়। জগদীশচন্দ্র এই চিঠিতে লিখিতেছেন— 'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে

১ আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে জগদানন্দ রায়ের রচনাবলী ১৩১৯ সালে "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন' ইত্যাদি।

পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহার সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান্। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিব না; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্য্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিও।

'আর-একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সন্ধানের কার্য্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।...

'আমি দুই বৎসরের Extentionএর জন্য India Officeএ আবেদন করিয়াছিলাম।... হঠাৎ খবর পাইলাম, যে, যদিও আমার scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets, ইত্যাদি।...

'ইতিমধ্যে British Association ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে আমার মত যে গৃহীত হইল তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধু, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পার ?

'আমি কি করিব জানি না। কার্লোর জন্য আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এদেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে ছুটী পাইব মনে হয় না।

'তুমি তপস্যার কথা লিখিয়াছ; বল ত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি।..

'যদি তুমি বল তাহা হইলে একবার দেশে থাকিয়া সমস্ত ছাড়িয়া এদেশে থাকিব।'

পত্র ১৪। 'কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় মাসে মজঃফরপুর গিয়া থাকিবেন; ১ শ্রাবণ ১৩০৮ (জুলাই ১৯০১) তথায় তাঁহার সংবর্ধনা।[১] এই পত্রের কাল এই সংবাদেও অনুমান করা যায়।

পত্র ১৪। 'শান্তিনিকেতনে··· একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি।'

এই পত্র লিখিবার কয়েক মাস পরে, ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে কল্পনা-দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরবর্তী কয়েকখানি চিঠিতে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন।

১ প্রবাসী ভাদ্র ১৩০৮, পৃ. ২০৫

পত্র ১৫। 'আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।'

পঞ্চম পরিশিষ্টে এই চিঠিখানি মুদ্রিত হইল ; মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রমেশচন্দ্রের চিঠির তারিখ (১৬ জুলাই ১৯০১) হইতেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত হইয়াছে।

২০ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত -প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। এদিকে দেশের মায়ার বন্ধনও সম্পূর্ণ কাটাইতে পারি নাই। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।'

পত্র ১৫। 'তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি··· বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।'

১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" প্রবন্ধে এই রেখাচিত্রগুলিই মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

৩০ আগস্ট ১৯০১ তারিখের পত্রে, রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান চিঠির প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তুমি আমাকে কয়মাসের জন্য আসিতে লিখিয়াছ, "সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে।" তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, যাহা ভাল মনে কর, আমার হইয়া কর। আমি কেবল এক কাজ বুঝি, আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কি না এই ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি

আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কি না তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম— এক! এক! সব এক! ··· বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না— আমি সব দেখিতেছি— কেবল সময়াভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্যও চলিয়া আসি? এজন্য আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দাও। কেবল তুমি কয়মাসের জন্য এখানে আইস।'

পত্র ১৬। 'তোমার ছবি আজ পাইয়া'

এই চিঠি জগদীশচন্দ্রের ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠির উত্তর; জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ হইতে রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত। জগদীশচন্দ্রের এই পত্রে ছবি পাঠাইবার উল্লেখ আছে। এই ফোটোগ্রাফ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সুরক্ষিত; বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে যে 'শিলাইদহের গ্রুপ' ছবির উল্লেখ আছে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ হইতে তাহাও মুদ্রিত হইল।

পত্র ১৬। 'তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানি।'

জগদীশচন্দ্র এই ছবির প্রতিলিপি পাঠাইয়া উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'আর একখানা ছবি তোমার বসিবার ঘরে রাখিও। ওয়াটের[১] "আশা" অন্ধ-বালিকা— যন্ত্রের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাই বাজাইতে চেষ্টা করিতেছে।

'আমাদের আশাও এই ভগ্নতন্ত্রীর মত।'

১ জি. এফ. ওয়াট্‌স্ (১৮১৭-১৯০৪)

পত্র ১৬। 'মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে'

লোকমান্য তিলক এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ জি. জি. আগরকর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করিবার পর স্থির করেন যে তাঁহারা সরকারি চাকুরি গ্রহণ না করিয়া দেশে স্বল্পব্যয়ে শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদের সঙ্গে যোগ দেন বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপালংকার। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ইহাদের চেষ্টায় পুনা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। তিলক ও তাঁহার সহকর্মীগণ মহারাষ্ট্রে সুপরিকল্পিত প্রণালীতে শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন; ফলে ১৮৮৪ সালে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'to facilitate and cheapen education by starting, affiliating and incorporating at different places, as circumstances permit, schools and colleges under private management or by any other ways best adapted to the wants of the people.'

এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ডেকান এডুকেশন সোসাইটি সুবিখ্যাত ফার্‌গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। টিলক এই কলেজে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গণিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়াছেন। রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপেও বিশেষ ত্যাগস্বীকার-পূর্বক এই কলেজে (১৯০২-২৪ সাল) যোগ দেন। মহারাষ্ট্রের অনেক সুসন্তান এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, পত্রে যাঁহাদের নাম উক্ত আছে তাঁহাদের কথাই উল্লিখিত হইল। ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ফার্‌গুসন কলেজ ব্যতীত আরও অনেকগুলি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন।[১]

১ এই তথ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংকলিত।

পত্র ১৬। 'বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার *Twentieth Century* পত্রের (প্রকাশ ১৯০১) ৩১ জুলাই ১৯০১ তারিখের সংখ্যায় নরহরি দাস এই ছদ্মনামে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের (আষাঢ় ১৩০৮) সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ঐ পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, রচনার নিদর্শন-রূপে কয়েক ছত্র উদ্‌ধৃত হইল—

'Naivedya is a natural offering of the human heart to the Divine—an offering of joy and sorrow, of struggle and fruition, of all-embracing love, of national aspiration and desire for union with the Unrelated....In all places of worship, be they Christian, Muhamedan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without scruple...The poet has sung again the old song of the Upanishads in a new strain and let it rise as a cry of our people to heaven, as a memorial for Divine grace...*Naivedya* is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace...'

এই সমালোচনাসূত্রেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়; জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার কথা বারবার স্মরণ করিয়াছেন। 'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে (১৩৪০) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।'[১]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছেন, এই উদ্‌যোগে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে প্রধান সহযোগী-রূপে লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।··· তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।'[২]

পত্র ১৬। 'আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে।'

১ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬০-৬১

২ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬১-৬২

বিবাহের তারিখ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮।[1]

'একটি ডাক্তার', সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

'তোমার বন্ধু', রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা।

পত্র ১৭। 'মিস নোবল্'

মার্গারেট নোবল্, ভগিনী নিবেদিতা (জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭, মৃত্যু ১৩ অক্টোবর ১৯১১)। ইনি জগদীশচন্দ্রের একজন প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'[2] রবীন্দ্রনাথের সহিতও এই সূত্রে নিবেদিতার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। নিবেদিতার ভাষায়— 'You are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be *my* friend too!'[3]

জগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে তাঁহার জয়বার্তা ভগিনী নিবেদিতাও অনেকসময় রবীন্দ্রনাথকে জানাইয়াছেন। এই পত্রে উল্লিখিত চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার অপর দুইখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম পরিশিষ্টে সেগুলি মুদ্রিত হইল; মূলপত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল; তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যও স্বীকার করিয়া-

১ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯, রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮, 'আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হওয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির করিয়াছি।'

২ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২৮

৩ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৪৩

ছেন। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন; নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাহা প্রকাশিত হয়।[১]

নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চরিত্রের যোগাযোগের বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী[২] গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ গোরা'র ইংরেজি অনুবাদক উইলিয়াম উইন্‌স্ট্যান্‌লি পিয়ার্সন্‌কে এক পত্রে (১৯২২) লেখেন[৩]—

You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now— but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.

নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধে[৪] এই 'লোকমাতা'র 'অমর জীবন'এর কথা— 'আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম' তাহার স্বরূপ— বিবৃত করিয়াছেন।

১ *The Modern Review*, January 1912

২ দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ২১৬-১৮

৩ Rabindranath Tagore, "Letters to W. W. Pearson", *The Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1943, p. 179

৪ 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৩১৮), পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড। এই প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ ভগিনী নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home* (1913) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা' প্রবন্ধে যে 'বিদুষী ইংরাজ মহিলা'-প্রেরিত বিবরণ অনূদিত হইয়াছে[১] তাহাও সম্ভবতঃ ভগিনী নিবেদিতা-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত।

পত্র ১৭। 'তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে··· জানিতাম না।'

এই উক্তি প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ১৫ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন—

'তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতে না। হয়ত জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে,— প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী, ধৈর্য্যশালী স্বজাতিপ্রেমিকের সংখ্যা দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ[২] তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি পুরুষও যদি এই ভাবে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১০৯-১১২

২ রবীন্দ্রনাথ পূর্ব চিঠিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় 'পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে' এই সংবাদ দিয়াছিলেন।

'তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখন কখন একেবারে নিরাশ্বাস হই।'

১৭-সংখ্যক পত্রের উত্তরেই জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি লিখিত এইরূপ মনে করিয়া ১৭-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১৮। 'বর্ত্তমান সঙ্কট।'

ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১)—

'আমার deputationএর extension পাইলাম না। ফার্লোই দিয়াছে। তজ্জন্য বিবিধ গোলমাল সহ্য করিতে হইবে। এ কয়মাস যাহা করিয়াছি এখন তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে। ইহাতে কতদিন থাকিতে পারিব জানি না। আর জার্ম্মেণী ও আমেরিকা যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

'তোমরা যদি পার তবে আমার মুক্তির সংবাদ শীঘ্র দিবে। আমার মন দিতে পারিতেছি না। যদি আমার কার্য্য নিরুপদ্রবে কয়বৎসর পর্য্যন্ত না করিতে পারি তবে হাত দিয়া কোন লাভ নাই।

'আমি যাহা করিতেছি তাহা অনেক প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ।…এই-জন্য এই কার্য্যে হাত দিতে হইলে বদ্ধ সংস্কারের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।… আমি প্রস্তুত আছি … আমাকে যদি নিশ্চিন্ত করিতে পার যে, আমার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না, তবে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।'

সম্ভবতঃ এই সংকটের কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ১১ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রেও জগদীশচন্দ্র এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের আর-একখানি পত্র (২৯ নভেম্বর ১৯০১) বিশেষ ভাবে উদ্ধারযোগ্য—

'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল?— কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখ-দুঃখের অংশী, সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।'

পত্র ১৯। 'আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া'

জড়, উদ্ভিদ, জীবের সাড়া ('Electric Response of Metal and of Ordinary Plants') সম্বন্ধে ১৯০১ সালের জুন মাসে রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের আপত্তির ফলে সোসাইটি তাহা প্রকাশ করেন নাই। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র "Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society" Linnean Societyতে পুনরায় ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার আবিষ্কার প্রচার করেন; এই সভায় কোনো বৈজ্ঞানিক আর তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই সভার বিবরণ দিয়া জগদীশচন্দ্র ২১ মার্চ [১৯০২] তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ

এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে।... সমবেত Physiologist-Biologist-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষ-কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে।... এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি।'

১৯-সংখ্যক পত্র জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি পাইয়া লিখিত, এই অনুমানে তাহার তারিখ এপ্রিল ১৯০২ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'গতকাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল' ইহাও ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের কথা; জগদীশচন্দ্র ৪ এপ্রিল ১৯০২ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্যারিস হইতে লিখিতেছেন—'এখানে ৪ স্থানে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি।'

পত্র ২০। 'তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?'

১ মে ১৯০২ তারিখের চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?

'তুমি ত এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।'

২০-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত হইতেও পারে এই অনুমানে উহার তারিখ কল্পিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের পূর্বপত্রের (৮ এপ্রিল ১৯০২) উত্তরেও ২০-সংখ্যক চিঠি লিখিত হইয়া থাকিতে পারে। উহাতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্ম-সাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের ক্রোড়ে, যেখানে সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শান্তিময়, সেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্বাস হও তবে আমি একা যুঝিয়া কি করিব?'

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জগদীশচন্দ্র এই সময় কিরূপ আবিষ্ট হইয়া ছিলেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ জগদীশচন্দ্রের ৩০ মে ১৯০২ তারিখের পত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'এতকাল কেবল কর্ম্মসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর-সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা— মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিস আছে।. সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে,

অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ,[১] মনে হয় যেন পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ, অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে— সে কথা কল্যাণী[২]— তুমি ঠিকই বলিয়াছ একথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।'

স্বীয় আবিষ্কার-বর্ণন-সূত্রে ঐ পত্রেই জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি— দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে-ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্ত্তিতরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরী করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ।[৩] সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির-অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।'

১ জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতার কথা উল্লেখ করিতেছেন— 'সেকাল', 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে', ক্ষণিকা (১৯০০)।

২ সম্ভবতঃ ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'কল্যাণী' কবিতার স্মরণে।

৩ জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মানসী গ্রন্থের (১৮৯০) 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার উল্লেখ করিতেছেন।

পত্র ২১। 'আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব— তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।'

বর্তমান গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৪ শ্রাবণ ১৩০৯ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ২১। 'আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে।'

ইহার নাম হোরি সান। 'ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন হোরি সান সংস্কৃত পড়িতে ··· সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম— ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজি, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কী নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জন শুরু করেন। অকালে পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি [এই ছাত্রের আগমন] অতি সামান্য— এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে; কিন্তু ভারতের ও পূর্ব-এসিয়ার বিস্মৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস।'[1]

পরবর্তীকালে চীন-জাপানের সহিত ভারতের যোগ পুনঃস্থাপনকল্পে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগ বহুবিদিত। আলোচ্য পর্বেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এ বিষয়ে যে-সকল কল্পনা চলিতেছিল রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি (১ জানুয়ারি ১৯০৩) হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—

'তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে

১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ৪২৬

তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।··· তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য— পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

'নবদ্বীপ ত সতীশ[১] যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কাপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

'একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

'আমার plan এই—

'এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে Tibetএর Mss. ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীনদেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

'এই প্রথম exploration হইতে অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে।'

পত্র ২৩। 'আমি পলাতক··· এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন?'

১ সম্ভবতঃ 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়।

এই চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের নিম্নমুদ্রিত পত্রখানির উত্তরে লিখিত, তদনুযায়ী ইহার তারিখ অনুমিত হইয়াছে। (যদিও 'সম্মান-সম্বর্দ্ধনা'-প্রসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -কর্তৃক ১৩১৮ মাঘে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার কথাও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন)—

'২৩ এ অক্টোবর ১৯০৫

'তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের[১] বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে।...

'তারপর জাতীয় ভবনে তোমার [পল্লী] সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির জায়গা থাকিবে।

'...এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

১ এই পত্র লিখিবার পূর্বদিন, 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়— ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিবার কারণে যে সার্কুলারের প্রতিবাদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় বলা যায়—'২০শে [অক্টোবর] তারিখেই জানা যায় সরকার... এক ইস্তাহার জারি করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিক অনুষ্ঠানে সভাসমিতিতে যোগ দিতে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'— শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'কংগ্রেস', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৬

'এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

'তুমি এবিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা স্থানে পঠিত হইবে।

'এসময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।'

ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২), 'ফেডারেশন হল' 'মিলনমন্দির' বা 'অখণ্ডবঙ্গভবন' -প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়, জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘোষণাপত্রে'র বঙ্গানুবাদ সভাস্থলে পাঠ করেন। সেই ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা লইয়াই জগদীশচন্দ্রের এই পত্র। উক্ত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠা-উদ্‌যোগেও রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন।[1] কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যে পথে পরিচালিত হইতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-অনুযায়ী ও আদর্শের অনুকূল হয় নাই ; এই

১ দ্রষ্টব্য কেদারনাথ দাসগুপ্ত -কর্তৃক প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা -সহিত শিক্ষার আন্দোলন [১৩১২] পুস্তিকা এবং *Calendar* 1906-1908, National Council of Education, Bengal, 1908। কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় ছাত্র ও ছাত্রহিতৈষীদের এই সময় যেসকল সভা হয় তাহার অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যথা— ১০ কার্তিক ১৩১২, পটলডাঙায় মল্লিকবাড়িতে ছাত্রসভা ; ১৬ কার্তিক, ফিল্ড অ্যাণ্ড্ অ্যাকাডেমি ভবনে নেতৃবর্গ ও ছাত্রগণের সান্ধ্যসম্মিলন ; ১৯ কার্তিক, ডন সোসাইটিতে ছাত্রসভা ; ৩০ কার্তিক, ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স্ অ্যাসোসিয়েশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নেতৃগণের মন্ত্রণাসভা ; ১ অগ্রহায়ণ, ফিল্ড্ অ্যাণ্ড্ অ্যাকাডেমিতে জাতীয় শিক্ষা-সমাজ -প্রতিষ্ঠার ঘোষণাসভা। ৩০ কার্তিকের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় -প্রতিষ্ঠার্থ যে

সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত হইয়াছে—

'ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধাপ্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিস্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাটমাত্র —যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব কিন্তু

প্রভিসনাল এডুকেশন কমিটি নিযুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২৪ অগ্রহায়ণ, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স্‌ অ্যাসোসিয়েশনে নেতৃবর্গের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কি না আমাদের জানা নাই, তবে এই সভায় জাতীয় শিক্ষাসমাজের গঠনপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইবে স্থির হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার সদস্য মনোনীত হন।

"নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২।'[1]

পত্র ২৪। 'নিজের শোক··· নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি'

১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর ১৯০৭)[2] রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের (জন্ম ১৮৯৪) মৃত্যু হয়; শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেইখানে রোগাক্রান্ত হন। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল -লিখিত বিবরণে[3] আছে—

'যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— "এ সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষ যাহা কর্তব্য আপনি করুন"·· আমরা দাহান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণ শ্রীশবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি ও শ্রীশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে তাঁহার ধারা আর থামে না, আমারও

১ বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩

২ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত তারিখ

৩ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, "রবীন্দ্র প্রসঙ্গ", দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

চক্ষে ধারা বহিতেছিল, এই সময় রবীন্দ্রনাথেরও চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। আমি তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহার সেই নিশ্চল গম্ভীর ভাব ও শোকপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় আতঙ্ক জন্মিতেছিল। সেইদিনই গাড়িতে বোলপুর চলিয়া যাওয়া স্থির হইল।... গাড়ি সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌছিতেই মাতুল মহাশয় ট্রেনের নিকট খাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন।... তিনি [রবীন্দ্রনাথ] মাতুল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব হইতেই জানা শুনা ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি মাতুল মহাশয়কে চুপে চুপে মুঙ্গেরের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি কিছুই টের পান নাই যে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক স্মিতমুখেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।... [শান্তিনিকেতনে] পরদিন বেলা হইলে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।... একটু কথা কহিতে গিয়াই তাঁহার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরও যেন বাহির হইতেছিল না।... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার পিঠটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মধ্যে মধ্যে 'রবি', 'রবি' এই শব্দ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যটি বড় করুণাপূর্ণ।'[১]

এই সময়ে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এরূপ লিখিয়াছিলেন—

'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা [শ্রীশচন্দ্রের

১ অপিচ দ্রষ্টব্য শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত "রবীন্দ্র স্মৃতি" প্রবন্ধের কবিপুত্র শমীন্দ্র অধ্যায়, দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯

পুত্র সরোজচন্দ্র] মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।… ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪।'

'ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি; আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইব— আমি পরাভূত হইব না।… ২৪শে মাঘ ১৩১৪।' —দ্র. চিঠিপত্র ১৩, পৃ ৬৬-৬৭

অগ্রহায়ণ মাসে শিলাইদহে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কয়েক মাস থাকেন— এই সময়ের মধ্যে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির কার্য, জমিদারিতে "পল্লীসমাজ" স্থাপন, 'গোরা' রচনা প্রভৃতি দেশহিতকর্ম ও সাহিত্যকর্ম অব্যাহত চলিতে থাকে[১]; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত বহু পত্রে[২] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। মৃত্যুশোক তাঁহার অন্তর্জীবনকে এ সময় কোন্ পথে প্রধাবিত করিতেছিল তাহার পরিচয় পাই এই কালে রচিত গানে (যথা, 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতম হে', ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪), ১৩১৪ সালের 'মাঘোৎসবে'র ভাষণে[৩], এবং ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত কোনো কোনো চিঠিতে, যেমন—

১ 'রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল [১৩১৪ ভাদ্র - ১৩১৬ ফাল্গুন] ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম… তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' —রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র", 'শান্তিনিকেতন', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। এই 'শোক' শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক; দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৪৬০

২ "রবীন্দ্রনাথের চিঠি", দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৯

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "দুঃখ", ধর্ম। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -কর্তৃক তাঁহার "কবি-কথা" প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

'আমাকে এখনো কিছুদিন ক্ষমা করিবেন। আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি— তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতে মন দিতে পারিব না। আমার বাহিরের সমস্ত কাজকর্ম্মের ভিতর হইতে অত্যন্ত একটা বেদনার তাগিদ আসিতেছে— আমাকে আমার অন্তরাত্মা ভারি একটা তাড়া লাগাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আপনারা আমার ছুটি বাড়াইয়া দিবেন।

'কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে যাহা কিছু আলোচ্য বিষয় আছে তাহা লিখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।··· ১লা ফাল্গুন ১৩১৪।'

'বিদ্যালয়ে আমাকে শীঘ্র টানিবেন না। আমার দুই একটা কর্ত্তব্যে হাত দিয়াছি— তা ছাড়া অন্তর্যামীর সঙ্গেও আমার বোঝাপড়া দরকার। অন্য কোন কাজে আমার মন যাইতেছে না। ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪।'[1]

এই 'ব্যাকুলতা' ও 'অন্তর্যামী'র সঙ্গে এই 'বোঝাপড়া'ই 'গীতাঞ্জলি'র সমকালীন গানে কবিতায় উৎসারিত হইয়াছে বলা চলে।

পঁচিশ বৎসর পরে, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহার মাতৃদেবী শ্রীমতী মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও, শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারংবার পরমাত্মীয়দিগের বিয়োগদুঃখকে তিনি কিভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে কথা বিবৃত হইয়াছে—

'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা

১ "রবীন্দ্রনাথের চিঠি", দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। ...২৮ আগস্ট ১৯৩২।"[1]

২২-সংখ্যক পত্রে মধ্যমা কন্যা রেণুকার, এবং ২৯-সংখ্যক পত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার পীড়ার উল্লেখ আছে। পত্র লিখিবার স্বল্প-কাল-মধ্যেই ইঁহাদের[2] মৃত্যু হয়। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করেন সে বিষয়ে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন—

'১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায়। জোড়া-গির্জার কাছে স্বামী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।

১ রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৪, পৃ ১৫২
২ রেণুকা, মৃত্যু ১৯০৩। বেলা, মৃত্যু ১৬ মে ১৯১৮

কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, "আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।"

'গাড়িতে আর কিছু বললেন না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্যদিনের মতো আমাকে বললেন, "উপরে চলো।"··· খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে।[1] তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম।··· ছেলেবেলার মতো বলত, বাবা গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হ'ল।" এই বলে চুপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত।

'সেদিন বিকালে ওঁর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে।" বললেন, "না, বদলাবে কেন? তার কোনো দরকার নেই।"

১ দ্রষ্টব্য— বেলা দেবীর মৃত্যু -প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি [১৯১৮], চিঠিপত্র ২, পৃ ৬৮

শ্রীমতী সীতা দেবীও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে বেলা দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন—

'প্রণাম করাতে, অন্যদিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, "বোসো।" মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেকদিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন।··· কয়েকবার কথা বলিলেন তাহার মধ্যে মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। কি কথায় একবার একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ করুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চব্বিশ বৎসর পরেও মনে আছে।··· যে শক্তিশেল তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল কথা-বার্তায় তাহার আর উল্লেখ মাত্র করিতেন না।' —পৃ ৩৫২-৫৫

পত্র ২৪

এই প্রবন্ধেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু[১] রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

'সে সময়··· দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কেমন আছে?' কবি শুধু বললেন, 'সে মারা গিয়েছে।' শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।'[২]

পত্র ২৪। 'কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গ'— 'চরমপন্থী' ও 'মধ্যমপন্থী'দের বিসংবাদে সুরাটে কংগ্রেস-অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯০৭) পণ্ড হইবার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধও ("যজ্ঞভঙ্গ"[৩]) লিখিয়াছিলেন— 'বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে···দুই দিকেরই এই জিদ যে বরং কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না।'

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে বেলা দেবীর মৃত্যুর সহিত 'পলাতকা'র (অক্টোবর ১৯১৮) "শেষ প্রতিষ্ঠা" কবিতাটি যুক্ত করিয়াছেন। বেলা দেবীর বিবাহের পর তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া (১৯০১) আসিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্নীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন (চিঠিপত্র ১, পৃ ৯১-৯২) তাহাও দ্রষ্টব্য।

১ মাতৃহীন পীড়িতা কন্যা রেণুকাকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপভাবে পরিচর্যা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জবানিতে তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীমতী রানী মহলানবীশ, "ওঁ পিতা নোঽসি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০

২ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'কবি-কথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

৩ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে প্রথম গ্রন্থভুক্ত।

এই সময় দেশে 'অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি' দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন'এর চিন্তায়[১] ও নিজের সাধ্যমত তাহার উদ্‌যোগে ব্রতী[২]— 'সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি'[১]— "যজ্ঞভঙ্গ" প্রবন্ধেও তিনি সেই কথা বলিলেন— 'মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন— দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন··· এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কন্‌গ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।··· সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে।··· কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক।'

ইহার স্বল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে[৩] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার অভিভাষণেও[৪] তিনি

১ দ্রষ্টব্য অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (২৯ পৌষ ১৩১৪), প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৬৮৫

২ বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ৯০) অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

৩ ১৯০৮, ১১ ফেব্রুয়ারি ; দিন ও মাস শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৫২) হইতে গৃহীত।

৪ সমূহ গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া" তুলিবার প্রণালী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রে পল্লীসমাজ-গঠনের স্বয়ং যে উদ্‌যোগ এই সময় করেন তাহার কিছু বিবরণ আছে অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রে[১]। 'পল্লীসমাজ'এর একটি বিস্তৃত কর্মসূচীও মুদ্রিত আকারে প্রচারিত হয়।[২]

পত্র ২৪। 'বন্দে মাতরম্ কাগজে··· কলহ চলিতেছে।'

বন্দে মাতরম্ পত্রিকা ১৯০৬ আগস্টে প্রকাশিত হয়, ১৯০৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলিয়াছিল; প্রথমে প্রায় দুই মাস কাল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রধান সম্পাদক ছিলেন, পরে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় প্রধানতঃ ইহার সম্পাদনা করেন; ১৯০৮ সালের মে মাসে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র পুনরায় ইহার ভার লইয়াছিলেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ এই কাগজের অনুরাগী পাঠক ছিলেন; ৯ ভাদ্র ১৩১৪ তারিখে আমেরিকাপ্রবাসী পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখিতেছেন—'Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে।'[৪] এই পত্র লিখিবার দুইদিন পূর্বেই

১ চিঠিপত্র, বর্তমান খণ্ড, পৃ ৯০

২ এটি ঠিক কোন্ সময়ে প্রচারিত হয় জানা যায় নাই; কয়েক বৎসর পূর্বে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের রচনাকালে (১৯০৪) হইতে পারে, অথবা আলোচ্য কালেও হইতে পারে। ইহা শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৬৩-৬৬) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

৩ বন্দেমাতরম্ পত্রের প্রকাশ সম্পাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে এই তথ্য শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী -প্রণীত শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৪ চিঠিপত্র ২, পৃ ৫-৬

রবীন্দ্রনাথ, বন্দেমাতরম্ পত্রে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশে 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি[১] রচনা করেন।

পত্র ২৫। 'গীতাঞ্জলি··· ইংরেজি গদ্যে তর্জমা'

'ওটা যে কেমন করে লিখলুম' সে বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ৬ মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে[২] রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

পত্র ২৫। 'শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে··· বক্তৃতা'

বিষয় "Ideals of the Ancient Civilisation of India"। এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে[৩]— আলোচ্য পত্রের তারিখও সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

পত্র ২৬। 'Mrs Boole'

এই প্রসঙ্গে জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৯শে বৈশাখ ১৩২০ তারিখের পত্র[৪] দ্রষ্টব্য—

'কাল আমরা Mrs Boole নামক একজন বিখ্যাত আঙ্কিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি সুতীক্ষ্ণ তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা

১ প্রকাশ: নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪। ১৩৪০ সাল হইতে সঞ্চয়িতায় সংকলিত।

২ চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৯-২১

৩ এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৩০ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের পত্র, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২, পৃ ৩০৪, এবং শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত ২২ জানুয়ারি [১৯১৩] তারিখের পত্র, চিঠিপত্র ৪, পৃ ৪৯

৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ ২৯০

ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

পত্র ২৬। 'একদিন এখানকার সভায় 'চিত্রা'র [চিত্রাঙ্গদার] ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভালো লাগিয়াছে।'

এই পাঠ-সভার একটি বিবরণ[১] উদ্‌ধৃত হইল—

An Indian Drama. A Reading By Mr. Rabindra Nath Tagore...The Indian Art, Dramatic and Friendly Society[২] .. has already made several serious efforts to fulfil its pofessed intention of bringing the East and the West into closer touch...The latest of these efforts took the form of a meeting yesterday afternoon, at which Mr. Rabindra Nath Tagore, who is described as India's "World Poet"... read his own translation of one of his own plays.

Before a large and deeply interested gathering that included many Anglo-Indians and many well-known men of letters Mr. Tagore lent over his reading-desk— a tall, slim figure dressed in tight-

১ Westminster Gazette, রবীন্দ্রসদনের কর্তিকা-সংগ্রহে প্রাপ্ত ; কাগজটির তারিখ রক্ষিত হয় নাই।

২ পত্রান্তরে লিখিত হইয়াছে India Society ; এই সোসাইটিই Gitanjali, Chitra ও One Hundred Poems of Kabir প্রথমে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ (ও অবনীন্দ্রনাথ) এই সোসাইটির সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

fitting garments of black ; a face with finely chiselled features and with the deep-set eyes and the high brow of the thinker ; long hair and a flowing beard in which grey is taking the place of black, and a strangely thin, but musical, voice. In the dusk of late afternoon the shaded light that was directed upon his manuscript was reflected in a copper glow upon his face ; and he read with hardly a gesture, without a break, and in the accents of a refined Englishman from the beginning of his short prose-poem to the end...

The reading was received with enthusiasm by the audience ; and the poet, a quiet, almost a shy man— was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded round him before he could escape from the room.

পত্র ২৬। 'আইরিশ থিয়েটারে আমার ডাকঘর নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।' এই প্রসঙ্গে বিদেশে ডাকঘর অভিনয়ের একটি বিবরণ[১] মুদ্রিত হইল—

The Abbey Theatre. First Performance Of A Tagore Play. On Saturday evening last [May 1913] a performance was given in the Abbey Theatre in aid of the Building Fund of St. Enda's College, when two plays were presented to a well filled but not overcrowded house. One was "The Post Office", by Rabindranath Tagore, the great modern Bengali

১ *Daily Express*, 19 May, 1913। কর্তিকা-সংগ্রহ, রবীন্দ্রসদন

poet...A large amount of interest was displayed in connection with the first production in Dublin of "The Post Office", especially as an appreciative lecture delivered a couple of months ago by Mr. W. B. Yeats introduced us to this striking Eastern personality, and a recently published translation of "Song-offerings" brought many readers into closer touch with his method and genius. The company must be congratulated on the minuteness with which they "made up" for the parts...The scenes were composed of Gordon Craig screens, and were arranged by Mr. J. F. Barlow...Too much praise cannot be given to Miss Lilian Jago for her impersonation of the pathetic part of Amal...Mr. Farrell Pelly was very good as the Dairyman, and Mr. Michael Conniffe as Gaffer. Mr. H. F. Hutchinson as the Watchman and Mr Philip Guiry as Madhav showed a very fine grasp of an unusual but apparently none the less congenial task. The other characters were ably represented by Miss Nell Stewart (Sudha), Mr. Charles Power (Doctor), Mr. James Duffy (Headman), Mr. Thomas Barrett (King's Herald), and Mr. Sean Connolly (King's Physician), while the "Boys" parts were taken by Desmond Murphy, Owen Clarke, and Horace Jennings.

পত্র ২৭। এই পত্রখানি ১৩২১ (১৯১৪) সালের ১ বৈশাখে লিখিত; রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে রোটেনস্টাইনকে লিখিত তাঁহার যে পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার তারিখ ১ মার্চ ১৯১৪, *Arts and Letters*

(London) পত্রের ১৯৫১ সালের প্রথম সংখ্যায় (পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) তাহা ছাপা হইয়াছে—

Dr. J. C. Bose will be in England some time next May and I have been wishing I could accompany him there.

১৯১৪ সালের এই 'জয়যাত্রা'য় জগদীশচন্দ্র অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, রয়াল কলেজ অব সায়ান্স্‌, রয়াল ইনস্টিট্যুশন প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিয়া বিশেষ সমাদৃত হন ; ভিয়েনা, প্যারিস, আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন।

পত্র ২৮। ১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়াছিলেন ; তথা হইতে সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যান ; এই চিঠি আমেরিকা হইতে লিখিত। আমেরিকা-প্রবাসের প্রথম ভাগে এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন এই অনুমানে পত্রের মাস নির্দিষ্ট হইয়াছে ; তবে আমেরিকায় ছিলেন জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। আমেরিকায় এইবার তাঁহাকে বিভিন্ন শহরে বহু বক্তৃতাদি করিতে হইয়াছিল[১], পত্রে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

পত্র ২৮। 'তোমার গান।'

জগদীশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের (প্রতিষ্ঠা ৩০ নভেম্বর ১৯১৭) উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে রচিত "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে"।[২] উদ্‌বোধন-উৎসব-পত্রী হইতে কবির হস্তাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হইল।

১ দ্রষ্টব্য, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), "আমেরিকায় বক্তৃতা" অধ্যায়।

২ গানটির প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত (১৩৫৬), পৃ ২২৯-৩০

পত্র ২৯। 'কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বলবার জন্যে'

১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেসের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ India's Prayer বা "Thou hast given us to live" এবং "Our voyage is begun, Captain" এই কবিতা দুটি পাঠ করিয়া প্রথম দিনের সভায় (২৬ ডিসেম্বর) উদ্‌বোধন করেন। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং এই বেদমন্ত্র, ও বন্দেমাতরম্‌ গীত হইবার পর, সভার সাফল্য কামনা করিয়া প্রেরিত পত্রাদি বিপিনচন্দ্র পাল -কর্তৃক পঠিত হইলে—

The Chairman of the Reception Committee [Baikuntha Nath Sen] then called upon Sir Rabindra Nath Tagore to read out his opening invocation. Sir Rabindra, who received a tremendous ovation, then recited the following verses in a voice, which, reaching the farthest corners of the pandal, hushed the vast audience with its heartfelt eloquence—

Thou hast given us to live...
Our voyage is begun, Captain...[১]

শ্রীমতী সীতা দেবী তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে আলোচিত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূম্র-আবরণে বেষ্টিত জলন্ত অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম আমি

১ এই বিবরণ নিম্নোক্ত প্রতিবেদনগ্রন্থ হইতে গৃহীত— *Report of the XXXII Session of the Indian National Congress held at Calcutta on 26th, 28th, and 29th December 1917* (1918)।

রবীন্দ্রনাথের *Poems* (1942) গ্রন্থে কবিতা দুইটি পুনর্মুদ্রিত।

যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার এই মূর্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিয়াছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের মনেও জাগিয়াছিল, এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়াওছিলেন।[১]...

'...কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তূর্য্যনাদের মত সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে যাইবামাত্রই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ও নীরব হইয়া গেল।'[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজরোষের পাত্রী মিসেস অ্যানি বেসান্ট্‌কে কন্‌গ্রেসের এই অধিবেশনে সভানেত্রী-নির্বাচনের প্রস্তাব লইয়া চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থীদের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব হয় সেই সূত্রে, 'সঙ্কটকালে লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড

২ শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ২৯৮-৩০০

১৯১৭ সালের কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিত্র লিখিয়াছেন জেম্‌স্ কাসিন্‌স্—

As political leaders were recognised on entering the great platform, they were uproariously greeted, with special emphasis for the President - elect [Mrs Annie Besant], and an immense climax for Sir Rabindranath Tagore, then at the peak of his fame. . .For the opening of the session he ascended a high pulpit with slow dignity, and recited the invocation...His descent to the platform was one of the unrehearsed scenes that make history. Mrs Besant rose quickly from her chair, met the poet, offered her hands to him and touched his hands with her forehead. Then Rabindranath offered his hands to Mrs Besant and bent from his height and touched her hands with his forehead.

—James H. Cousins in *We Two Together* (1950), pp 316-17

হইতে স্বীকার করিলেন।'[১] মধ্যমপন্থীগণ মিসেস বেসাণ্টের সভানেত্রী-পদে নির্বাচনে স্বীকৃত হইলে, 'রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে বিপদনিবারণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে— গোল মিটিয়া গেলে সে পদ ত্যাগ করিলেন।'[১]

'এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যাঁহাকে বাস্তবিক সম্মানার্হ করিয়াছেন, তিনি লোকের কাছে সম্মান পাইতেছেন কি না, সে চিন্তা কেন মনে স্থান দিবেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাঁহার বিরোধীরাও বুঝিতে পারিবেন যে তিনি বরাবর কর্ত্তব্যবুদ্ধি-ও-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনাসক্তভাবে কাজ করিয়াছেন।'[২]

পূর্বকথারূপে এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে—

১৯১৭ সালের জুন মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তন-চেষ্টার ফলে, 'নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত'[৩] হয়। 'কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে,

১ শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৩১০

২ [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], "রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪

৩ "প্রতিবাদের অধিকার", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪

এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট টাউন হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না[১], কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।'[২] এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া [৪ অগস্ট ১৯১৭] রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

'যখন বঙ্গের গবর্ণর টাউনহলে শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারী করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি "রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীস" ("novice in politics") রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরীতে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।'[৩]

সরকারী আদেশে অন্তরায়িতা শ্রীমতী বেসাণ্ট্‌কে সমবেদনা-জ্ঞাপন-পূর্বক চিঠি লিখিয়াছেন এই সংবাদে বিচলিত কোনো ইংরেজ

১ "এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?" —রবীন্দ্রনাথ, পরে উল্লিখিত "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধ।

২ "প্রতিবাদের অধিকার", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪

৩ [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], "রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪

বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাহাতেও সরকারী নিপীড়নব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।[১]

কংগ্রেসের সময় দেশকে যে-সকল কথা বলিবার জন্য "অন্তরে বাহিরে তাগিদ" অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এই সময়ে রচিত "ছোট ও বড়"[২] "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ"[৩] প্রভৃতি প্রবন্ধে—

'ভিক্ষার দানে[৪] আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না।...বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না।... ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না।'[৫]

পত্র ২৯। 'নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা'

এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন— বহিখানির নাম *The Web of Indian Life*। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত ইহার নবসংস্করণে এই ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়, ভূমিকার তারিখ ২১ অক্টোবর ১৯১৭।

১ "The Internments and Mrs Besant। Sir Rabindranath Tagore's Letter", *Bengalee*, September 7, 1917

২ প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪ ৩ প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪

৪ ভারতসচিব মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ অগস্ট, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট দায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন, সেই কথাই উল্লিখিত।

৫ "স্বাধিকার-প্রমত্তঃ", প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪, পৃ ৩৩০

পত্র ২৯। 'তোমাদের লেক্‌চারের জন্যে'

'ভবিষ্যতে এই [বসু-বিজ্ঞান-] মন্দিরে আরও অনেক নূতন নূতন বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞান ছাড়া বিদ্যার অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও বক্তৃতা হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতা করিবেন।'[১]

পত্র ৩০। 'অজিতের অকালমৃত্যু'[২]

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগ দেন; তরুণ বয়সেই তিনি সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকার -রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; বিপিনচন্দ্র পাল ১৩১৮ চৈত্র -সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "চরিত-চিত্র। রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে, রবীন্দ্রসাহিত্য যে বস্তুতন্ত্রতাহীন এই মতবাদের প্রচার করেন; তাহার প্রতিবাদ করেন অজিতকুমার ১৩১৯ আষাঢ় -সংখ্যা প্রবাসীতে, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন" এই প্রবন্ধে। ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে অজিতকুমার "বৈষ্ণব কবিতা" নামে একটি প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহার ফলে নারায়ণ, উপাসনা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রে তাঁহাকে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়— ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের ("একখানি পত্র", নারায়ণ, মাঘ ১৩২৪) ন্যায় 'প্রবল পক্ষ'ও ছিলেন। ১৩২৫ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে অজিতকুমার

১ "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪

২ অজিতকুমারের দুরারোগ্য পীড়ার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিয়াছিলেন—

'...অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল— ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে।'

ইঁহাদের সকলেরই বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দেন।

পত্র ৩১। জগদীশচন্দ্র বাংলায় যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই সংকলন 'অব্যক্ত' নামে ১৩২৮ সালে বাহির হয়। নিম্নপত্র[১]-সহ জগদীশচন্দ্র উহা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়াছিলেন—

কলিকাতা
৩রা অগ্রহায়ণ
১৩২৮

বন্ধু

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

এই পত্র ও গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকারে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি লিখিত।

পত্র ৩২। এই চিঠিখানিতে বন্ধনীমধ্যে অপর যে তারিখ অনুমান করা হইয়াছে তাহার কারণ, পত্রের শেষে বিশ্বভারতীর কনস্টিট্যুশন-রেজেস্ট্রির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তারিখ ১৬ মে ১৯২২; মুদ্রিত কনস্টিট্যুশনে এই তারিখ দেওয়া আছে।[২]— জগদীশচন্দ্র, বিশ্বভারতীর

১ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে ১৩৪৫ পৌষের প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত।

২ বিশ্বভারতীর প্রথম যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ চিঠিখানির এই অনুমিত তারিখ সমর্থন করেন।

'প্রধান' (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) -পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পত্র ৩৩। 'অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম।'

এই বৎসর (১৯২৬) মে মাস হইতে কবি বিদেশভ্রমণে রত ছিলেন, ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পত্র ৩৩। 'আমার নামে উৎসর্গ-করা তোমার যে বই'

জগদীশচন্দ্র ১৯২৬ সনের ২১ এপ্রিলে লিখিতেছেন'—'Nervous Mechanism in Plants তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *Sacrifice and other plays* (1917) -এর অন্তর্গত *Sannyasi or the Ascetic* (প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর অনুবাদ) জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। পূর্বে, কথা (১৩০৬) ও খেয়া (১৩১৩) উৎসর্গ করিয়াছিলেন—উৎসর্গ-কবিতা দুইটি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত।

পত্র ৩৫। 'তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে'

এই সময় জগদীশচন্দ্র নিকটাত্মীয়ের কঠিন পীড়ায় উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের ২২ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত।[১]

পত্র ৩৫। 'তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায়'[২]

১ এই পত্র মুদ্রিত হয় নাই, রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আছে।

২ On the 30th November, 1928, Sir Jagadis completed the seventieth year of his life. A movement to **celebrate** the event was inaugurated by Sir Jagadis's life-long friend and admirer, the poet Rabindra Nath Tagore, with whom were associated some of the foremost of the great savant's pupils.

—*The Calcutta Municipal Gazette*

Sir J. C. Bose Supplement, 27 November, 1937

জগদীশচন্দ্র ২২ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের পূর্বোক্ত পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন—

'১লা ডিসেম্বরে আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।'

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেন তাহা বনবাণী গ্রন্থে সংকলিত; বর্তমান গ্রন্থেও কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইল।

জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের অপর অংশও উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

'তুমি যে মনের কষ্টে আছ তাহাতে আমি তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতেছি। ত্রিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্ম্মী। তোমার কষ্ট আমাকে আঘাত করে। যদি কোন রকমে তোমার অভীষ্ট সাধনে সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব।

'তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্য্যে আমি তোমার চিরসহায় মনে করিও।

'আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কাজ হইয়াছে এবং হইবে। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।...

১ এই পত্র মুদ্রিত হয় নাই, রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আছে।

'শেষদিন পর্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মাণ হইব না। অন্তত আমরা দুজন একে অন্যের ভার বহন করিব।'

পত্র ৩৬। পত্রখানির সাল ইত্যাদি অনুমান করা যায় নাই বলিয়া ইহা সর্বশেষে বসানো হইয়াছে। তবে চিঠিখানি শান্তিনিকেতন হইতে বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে লিখিত এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্র

পত্র ১। দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ৪ জুন [১৯০১] তারিখের পত্র, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ২৮

পত্র ২। 'নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে।'

এই জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো— বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় নবজাগরণে ইঁহার উৎসাহবাণী কতদূর ফলবতী হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ জাপানে একটি বক্তৃতায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—

The voice of the East came from him to our young men... one of the influences which acted towards the awakening of spirit in Bengal flowed from the heart of that great man, Okakura...[১]

১ Rabindranath Tagore, *On Oriental Culture and Japan's Mission*, Lecture delivered at the Industrial Club, Tokyo, May 15, 1929, pp. 1-12.

পত্র ৩। 'আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায় ·· আমি রণে ভঙ্গ দিব না।'

ইহার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কন্যা রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র ৩। 'আর কই মাছ নয়।'

'বৌঠাকুরাণী' অবলা বসুর মৎস্যরন্ধনকলায় পটুতার সপ্রীতি উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে আছে; সম্ভবতঃ পত্নী ও কন্যা -বিয়োগে, এ সময় রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী।

পত্র ৪। 'আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী (মৃত্যু ১২৯১)। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতির "মৃত্যুশোক" অধ্যায়, ও ছেলেবেলা গ্রন্থ।

পত্র ৫[১]। এই পত্রে ভগিনী নিবেদিতার পীড়ার উল্লেখ অনুসরণ করিয়া নিবেদিতার জীবনকথা হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখি যে, তিনি ১৯০৫ (১৩১২) ও ১৯০৬ (১৩১৩) সালে দুইবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দুইবারই তিনি জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন— ১৯০৫ সালে অগস্ট মাসে পীড়িত হইয়া কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন, অক্টোবরে জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর শুশ্রূষায় দার্জিলিঙে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীর মজঃফরপুরে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে যাইবার কথা এই পত্রে আছে; অপর একটি উল্লেখ পাওয়া যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে— 'মীরা, বেলার কাছে মজঃফরপুরে গেছে··· ২৭শে কার্ত্তিক ১৩১৩।'[২]

১ প্রবাসীতে চিঠিখানির তারিখ এইরূপ মুদ্রিত হয়— '১৩ [কীটদষ্ট]'।

২ স্মৃতি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলির সংগ্রহ (১৩৪৮), পৃ ৫৯।

এই উভয় বিবেচনায়, পত্রের তারিখ ১৩১২ বা ১৩১৩ হইতে পারে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ৬। দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ২৪-সংখ্যক পত্র, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৫৫, এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

অবলা বসু -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ২০ মার্চ ১৯০৮ তারিখের পত্রের[১] উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র ; তদনুযায়ী ইহার তারিখ অনুমিত হইয়াছে। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা জানিয়া অবলা বসু মহোদয়া উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয় শোকদুঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই, আপনার ধৈর্য্য ও ঈশ্বর-প্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ আশ্বস্ত হই। আপনি যে-সব গুরুতর আঘাত পাইতেছেন তাহা সামলাইয়া প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের মত আরও গভীরতমভাবে সাধু কার্য্যে ও চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা যায়। আপনার অসামান্য সহ্যগুণ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সেবার বড় দিনের ছুটীর সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয় লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে-কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

'যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন সে সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল। আপনি মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা

১ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪

দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি— আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হোক্। [পাবনায়] প্রাদেশিক [সম্মিলনীর] অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন।'

পত্র ৬। 'আমাদের ব্রাহ্মধর্ম'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মঃ' গ্রন্থ।

পত্র ৭। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর এই পত্র লিখিত।

পত্র ৭। 'মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি।'

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্বে, সেপ্টেম্বর মাসে, রবীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই রোগমুক্তির পর 'প্রান্তিক' কাব্য লেখেন।

'সত্যের মন্দিরে তুমি।'

এই কবিতা কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, ১৯০০-০২ সালে জগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে রচিত ও তাঁহার নিকট প্রেরিত। ১৩৪৪ চৈত্র -সংখ্যা প্রবাসীতে কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

'সত্যরত্ন তুমি দিলে'

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথের ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ তারিখের পত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

'জগদীশচন্দ্র বসু' : ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি

এই কবিতা ১৩০৮ আষাঢ় -সংখ্যা বঙ্গদর্শন পত্রে, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে, মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতাটি 'উৎসর্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৬ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতারই প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছেন—

'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই…'

প্রখ্যাত কবি মনোমোহন ঘোষ এই কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন— Theodore Douglas Dunn -কর্তৃক সম্পাদিত *The Bengali Book of English Verse* (1928) গ্রন্থে সংকলিত।

'সম্বর্ধনা-সঙ্গীত' : জয় তব হোক জয়

১৯০২ সালে সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে[১] জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনের জন্য একটি 'সারস্বত সম্মিলন'এর আয়োজন করেন (১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে); 'সেই সম্বর্ধনানুষ্ঠানের সভাপতি— কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর। অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—

জয় তব হোক জয়।'[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না যে, সরলা দেবীর রচিত সুবিখ্যাত সংগীত "বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিণি" গানটিও এই সময় জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত।[৩]

'বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা'

উদ্ভিদে জীবনের সাড়া সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার বিশেষ একটি

১ দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের ১৯০২, ১৯ সেপ্টেম্বরের পত্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

২ শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'সঙ্গীত সমাজ' প্রবন্ধে এই সম্মিলনের বিবরণ লিখিয়াছেন ; অনুষ্ঠানের তারিখ, উদ্ধৃতাংশ ও রবীন্দ্রনাথের গানটি ঐ প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে আরো বিবরণ ও 'সঙ্গীত সমাজ'এর পরিচয় ঐ প্রবন্ধে আছে। গানটি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের নিকট রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের একটি খাতায় গানটির পাণ্ডুলিপি আছে, তাহার প্রতিরূপ মুদ্রিত হইল। হস্তাক্ষরের প্রতিরূপে ও মুদ্রিত পাঠে কিছু পার্থক্য আছে।

৩ এই গানটি 'বন্দনা' নামে, ১৩০৯ ফাল্গুন -সংখ্যা ভারতী পত্রে, নিম্নমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য -সহ প্রকাশিত হয়—

'এই বৎসর সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতায় বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে সম্মান ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি তদুপলক্ষ্যে বিরচিত।'

বাহন ছিল লজ্জাবতী লতা, ইহা সুবিদিত[১] ; এই কবিতায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাও লক্ষগোচর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি অবান্তর হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তির পর শান্তিনিকেতনে সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দনসভা হয় তাহার সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি এই উপলক্ষ্যে, সম্ভবতঃ স্বীয় সাধনার প্রতীকস্বরূপ, 'ছোট মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে [রবীন্দ্রনাথকে] উপহার দিলেন।'[২]

পরিশিষ্ট ২

'আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে'

ইহা ১৩০৫ পৌষ -সংখ্যা প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্দিরাভিমুখে' প্রবন্ধের একাংশ। 'ম্হাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাষ্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে।' এই মূর্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লিখিত ; সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি এ যাবৎ কোনো-গ্রন্থ-ভুক্ত হয় নাই। প্রদীপে, রচনার সহিত লেখক-রূপে রবীন্দ্রনাথের নাম নাই, তবে সূচীতে আছে।

স্বীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে আলোচনা ও প্রচার -পূর্বক বিলাতপ্রবাস ('First Scientific Deputation',

১ দ্রষ্টব্য, জগদীশচন্দ্র বসু, "আহত উদ্ভিদ্", অব্যক্ত গ্রন্থ

২ শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ১২৪

১৮৯৬-৯৭) হইতে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, এই প্রবন্ধ রচিত ; ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন, রয়াল ইনস্টিটিউশন প্রভৃতিতে জগদীশ-চন্দ্রের বক্তৃতা এ সময় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা।'

'জড় কি সজীব ?'

রবীন্দ্রনাথের ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে এই দুটি প্রবন্ধ উল্লিখিত— রচনা দুইটি ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শন পত্রে যথাক্রমে আষাঢ় ও শ্রাবণ -সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময় জগদীশচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় বিজ্ঞান-যাত্রায় (১৯০০-০২) বিদেশে সুধীসমাজে আপনার আবিষ্কার -প্রচারে প্রবৃত্ত। বঙ্গদর্শনে রচনা দুটির শেষে বা সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম নাই, তবে এ সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তাঁহার সকল রচনা বিনা স্বাক্ষরেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্র -দ্বারাও রচনা দুইটি যে তাঁহার, এ কথা সমর্থিত।

'এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে'

১৩১১ আষাঢ় বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। উক্ত প্রবন্ধ পরে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে সংকলিত। চতুর্থখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

'আমাদের যাহা নাই'

১৩১২ জ্যৈষ্ঠের ভাণ্ডার পত্রে মুদ্রিত 'বিজ্ঞানসভা' প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। অধুনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত আছে।

'পত্র-পরিচয়'

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী'র প্রকাশ প্রবাসী

পত্রে ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া পৌষ-সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। উহার ভূমিকাস্বরূপ এই 'পত্র-পরিচয়' প্রথম কিস্তির প্রারম্ভে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) মুদ্রিত হইয়াছিল।

'জগদীশচন্দ্র'

জগদীশচন্দ্রের পরলোকগমনের (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রে (পৌষ ১৩৪৪) প্রকাশিত হয়।

রচনাটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি রূপ ১৯৩৮ জানুয়ারি -সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

১৯৩৭ ডিসেম্বর -সংখ্যা বিশ্বভারতী-নিউজ পত্রে এবং মডার্ন রিভিউ পত্রে জগদীশচন্দ্রের স্মরণে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্রের পরলোক-গমনের পর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁহার জন্মদিনের তথা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নভেম্বর) প্রতি বৎসর 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু -স্মৃতি' বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বক্তা নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার লিখিত ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] 'তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আসিতে না পারায় উহা আচার্য্য মহাশয়ের এক বৃদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র[৩] কর্তৃক পঠিত হয়।'[৪] ইহা বিশ্বভারতী

১ ঐ প্রবন্ধের শেষে টীকা আছে যে, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন উহা তাহারই অনুমোদিত অনুবাদ।

২ Sir Jagadish Chandra Bose | Memorial Address | By | Dr. Rabindra Nath Tagore | 30th November 1938 | Bose Institute

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪১২

কোয়ার্টালি পত্রে (নভেম্বর ১৯৩৮) এবং মডার্ন রিভিউ পত্রেও (ডিসেম্বর ১৯৩৮) মুদ্রিত হইয়াছিল।

শেষোক্ত ইংরাজি রচনা দুটিও 'জগদীশচন্দ্র' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে এই গ্রন্থে সংকলিত হইল।

পরিশিষ্ট ৩

১. এই চিঠির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীসত্যরঞ্জন বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় (পৃ ১৪) মুদ্রিত।

২. এই পত্র রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশায় [১৩৪৮] প্রকাশিত (পৃ ১১০-১১)।

৩. চিঠিখানি ১৩৫০ বৈশাখ-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৬০০) মুদ্রিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বসুর ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্র পাইয়া এই চিঠি লিখিত— জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের ভাষাও অংশতঃ এই পত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী এই চিঠি এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত পূর্ববর্তী পত্রের আগে বসিবে। বিশ্বভারতী পত্রিকায় চিঠিখানির পোস্ট্‌মার্ক্‌ উল্লিখিত হইয়াছে— Shelidah 2 Oct [1900]। মূল পত্র রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত।

৪. এই চিঠিখানি ১৩৪৯ আশ্বিন-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের যে পত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহার তারিখ ২০ জুলাই ১৯০১।

৫. এই পত্র ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। আগরতলার শ্রীশৈলেশ দেববর্মার উদ্‌যোগে প্রাপ্ত।

৬. পত্রখানির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীসত্যরঞ্জন বসুর সৌজন্যে

প্রাপ্ত। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে চিঠিখানি ১৩৬০ শারদীয় সংখ্যা ত্রিপুরার কথা (আগরতলা) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭. এই পত্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

৮. এই চিঠিখানি ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ -সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৩৩৩) প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট ৪

'প্রশ্নোত্তর'

ভাণ্ডার (১৩১২-১৪) পত্রিকার সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রে একটি 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; সাধারণতঃ দেশের প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইত, এবং দেশের অনেক মনীষী উত্তরে সে সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিতেন। ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা ভাণ্ডার হইতে এই প্রশ্নোত্তর উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

এই রচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি অনুধাবনযোগ্য—

'16-5-1905

[২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২]

'...ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষচর্মে আবৃত সিংহনাদ লোকে বুঝিতে পারিবে। এরূপ লেখা হইলে আমার বইখানা সহজেই বোধগম্য হইবে।'

সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার -বিষয়ে বাংলায় বই লিখিবার বা সম্পাদন করিবার কল্পনা এ সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল ; তুলনীয় জগদীশচন্দ্রের ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠি।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বাঙালী মনীষীপ্রধানদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয় জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এবং দেশবাসীর প্রতি সমিতির নিবেদনপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব ("রবীন্দ্র-জয়ন্তী") উপলক্ষ্য করিয়া 'সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান'-এর ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় যে 'পরামর্শ সভা' বা 'উদ্বোধন সভা' (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয় তাহার আহ্বান-পত্রে (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) প্রথম স্বাক্ষর জগদীশচন্দ্রের— তিনিই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে *Golden Book of Tagore* (১৯৩১) প্রকাশিত হয় তাহার অন্যতম উদ্‌যোক্তা বা sponsor ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু[২]।

জগদীশচন্দ্র গোল্ডেন বুক অব টাগোর গ্রন্থে যে নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' (১৩৩৮) পুস্তকে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হয়; তাহাতে জগদীশচন্দ্র বলেন, 'জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে-তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন।'

১ *The Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement, 13 September 1941, p. lvii

২ অন্যান্য sponsor ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, রম্যাঁ রলাঁ, আলবার্ট্ আইন্‌স্টাইন, কস্টেস পালামাস।

উৎসবানুষ্ঠানে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) জগদীশচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথকে নিম্নমুদ্রিত পত্রে[১] শুভকামনা জ্ঞাপন করেন—

গিরিধি

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১

বন্ধু—

তুমি জয়যুক্ত হও।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

অবলা বসু মহোদয়া রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্য-প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

'জীবনের শেষ বৎসরও উনি [জগদীশচন্দ্র] প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর,

আজি হতে শতবর্ষ পরে

শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।'[২]

১ *The Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement, 13 September 1941, p. lxiii

২ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৭২

যাঁহাদের সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়ে বিশদ আলোচনা আছে, বর্তমান তালিকায় তাঁহাদের নাম তারকাচিহ্নিত ; অপিচ গ্রন্থপরিচয়ের পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬০-৬১।

* অজিত। দ্রষ্টব্য পৃ ২৩৭।

অধ্যাপক (পৃ ৮৫), অধ্যাপকমহাশয় (পৃ ৮৩)। জগদীশচন্দ্র বসু।

অরবিন্দ। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় শ্রীঅরবিন্দমোহন বসু, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ইঁহার কৃত বলাকাকাব্যের ইংরেজি অনুবাদ : *A Flight of Swans*।

'আমার জামাতা।' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

'আর্য্যা', পৃ ১২। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু।

* আর্য্যা সরলা। দ্রষ্টব্য পৃ ১৭১।

* 'একটি জাপানী'। ওকাকুরা কাকুজো। দ্রষ্টব্য পৃ ২৪১-৪২।

* 'একটি জাপানী ছাত্র'। হোরি সান। দ্রষ্টব্য পৃ ২১৩-১৪।

'কুচবিহার'। কুচবিহার-মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

কুঞ্জবাবু। কুঞ্জলাল ঘোষ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা, এক সময়ে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন।

'চীনদেশী বন্ধু।' ইনি চীনদেশীয় কবি Tsemon-Hsu। ১৯২৪ সালে চীনভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার অন্তরঙ্গতা হয়, এই সময়ে অধিকাংশ কাল তিনি কবির সঙ্গী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ *Talks in China* গ্রন্থ (১৯২৫) ইঁহাকে উৎসর্গ করেন—"to whose kind

offices I owe my introduction to the great people of China."

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতনের পরলোকগত অধ্যাপক, 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩১৯) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ সরল সুবোধ্য ভাবে রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে ইহার প্রবন্ধাবলী অন্যত্র উল্লিখিত।

* তিলক। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। দ্রষ্টব্য পৃ ২০২।

'তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরা', 'তোমার বন্ধু মীরা' বা 'তোমার বন্ধুটি'। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২)।

ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে ইহার প্রবন্ধ অন্যত্র উল্লিখিত।

* দ্বিজেন্দ্রলালবাবু। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬৪-৬৫।

দেবেন। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, বর্তমান বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ।

ধর্ম্মপাল। অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩), মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

'নাটোর'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। পঞ্চভূত গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ইহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

* পরক্ষণে। দ্রষ্টব্য পৃ ২০২।

পিসিমা। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী। 'শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি।'— শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মৃণালিনী দেবী", কবির কথা গ্রন্থ, পৃ ২৩।

বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সাহিত্য-শিষ্য।

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষক, পরে শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব," কবিপ্রণাম গ্রন্থ।

বেলা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮)।

বৌঠাকুরাণী, বৌঠাকরুণ। অবলা বসু।

বৌমা। জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ শ্রীপ্রতিমা দেবী।

মহারাজ (পৃ ১৩, ১৭, ২৩-২৫)। ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্য।

* মিস নোব্‌ল, নিবেদিতা। মার্গারেট নোবল, ভগিনী নিবেদিতা। দ্রষ্টব্য পৃ ২০৫-০৭।

Miss Macleod। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-শীলা মার্কিন মহিলা।

Mrs Knight। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পসংকলন প্রভৃতির অনুবাদিকা।

মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২)

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। এক কালে শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিচিত্রপ্রবন্ধ গ্রন্থে (১৯১৭) বন্ধুস্মৃতি অধ্যায়ে ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ইঁহার স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

যোগেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র যোগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

রথী। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৮৮)।

রমণী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

(১৮৫৯-১৯১৯) ; শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম তিনজন ন্যাসরক্ষকের অন্যতম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হইতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনকার্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে তিনি ত্রিপুরারাজ্যের মন্ত্রীপদেও বৃত হইয়াছিলেন।

রমেশবাবু। প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। জগদীশচন্দ্র-প্রসঙ্গে ইহার পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা (১৮৯০-১৯০৩)।

রোটেনস্টাইন। খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেন্‌স্টাইন — এই 'স্বভাববন্ধু'র যোগে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে 'ইংলণ্ডের ভাবুক-সমাজে' প্রথম সুপরিচিত হন। পথের সঞ্চয় গ্রন্থে "বন্ধু" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন। রোটেন্‌স্টাইন রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ও যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার *Men and Memories* গ্রন্থে।

* লরেন্স। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬১-৬৩।

লোকেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত। তারকনাথ পালিতের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক বন্ধু। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি গ্রন্থের "লোকেন পালিত" অধ্যায়।

শরৎ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

সমাজপতি। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ১৩০৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

সম্পাদক (পৃ ৮৫)। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন -সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

সুকেশী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী।

সুবোধ। সুবোধচন্দ্র মজুমদার, এককালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

সুরেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধ অন্যত্র উল্লিখিত।

সুরেন্দ্রবাবু। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে, দেশনায়ক প্রবন্ধে (পঠিত ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ "কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার" করিবার প্রস্তাব করেন, এবং সুরেন্দ্রনাথকে "সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য" সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬১২-৫৬।

সুরেশ। সুরেশচন্দ্র নাগ।

হেমলতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী।

বর্তমান খণ্ড চিঠিপত্র পুস্তকে মুদ্রিত জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ১, ১১, ১৩, ১৮, ৩১-৩৩ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ১-৩ -সংখ্যক মূল পত্র, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু ও তাঁহার সহধর্মিণী নলিনী বসু অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ২১, ২২, ৩৪ ও ৩৫ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ৪ ও ৬ -সংখ্যক মূল পত্র, অবলা বসু মহোদয়া বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলেন, সেগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। বর্তমান গ্রন্থ -প্রকাশে এই চিঠিগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

চিঠিপত্র গ্রন্থমালার পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী মূল পত্রের, তদভাবে সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের, পাঠ বানান ইত্যাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এইজন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বানানপদ্ধতির তারতম্য লক্ষিত হইবে।

গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কোনো কোনো আনুষঙ্গিক বিষয়, যথা কোনো কোনো ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তিপরিচয় -প্রসঙ্গে, অমল হোম, কুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রমোহন বসু, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় ও রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর পত্রোত্তর তথ্যনির্ণয়ে সহায়ক হইয়াছে। তথ্যনির্বাচন-পদ্ধতিতে শ্রীকানাই সামন্ত ও প্রবোধচন্দ্র সেনের পরামর্শ পাওয়া গিয়াছে। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কোনো কোনো উপকরণ ও তথ্য নির্দেশ করিয়া প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। অমল হোম কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রখানি শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আরও অনেকে অনেক বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত

হইয়াছে। সম্পাদক ও প্রকাশক ইঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে ইচ্ছা করেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতে তারিখ নাই; পত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা হইতে, বা রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর সাহায্যে তারিখ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই-সকল অনুমিত তারিখ [ ] বন্ধনী -মধ্যে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যার নিম্নে ছোটো অক্ষরে যে তারিখ ছাপা হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে— পত্রপারম্পর্য সহজে লক্ষগোচর করিবার উদ্দেশ্যে, পত্রে মুদ্রিত বা অনুমিত তারিখ ঐভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

মে ১৯৫৭

বর্তমান সংস্করণে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুইখানি এবং অবলা বসুকে লিখিত একখানি পত্র সংযোজিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রটি 'সংযোগ' পত্রিকায়, বর্ষ ১, সংখ্যা ২ : আশ্বিন ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শ্রাবণ ১৩৯৯

—